বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি
ও
শ্রম অর্থনীতি ২০১৭

Safety & Rights

Promoting Safety, Enforcing Rights

সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি

বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি
ও
শ্রম অর্থনীতি ২০১৭

Safety & Rights

Promoting Safety, Enforcing Rights

সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি

বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি ও শ্রম অর্থনীতি ২০১৭

সংকলন, সম্পাদনা ও প্রকাশনা
সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস)
১৪/২৩ বাবর রোড (৫ম তলা)
ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
ফোন: +৮৮ ০২ ৯১১৯৯০৩-৪, +৮৮ ০১৯৭৪৬৬৬৮৯০
ই-মেইল : info@safetyandrights.org
ওয়েবসাইট : www.safetyandrights.org

প্রকাশকাল
জানুয়ারি ২০১৮

স্বত্ব
সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস)

দাম
১০০ টাকা

The State of labor rights and labor economy of Bangladesh 2017

Documentation, Editing and Publication
Safety and Rights Society (SRS)
14/23 Babor Road (4th floor), Block B
Mohammadpur, Dhaka 1207
Tel: +88 02 9119903-4
Mobile: +88 01974 666890
Email: info@safetyandrights.org
Web: www.safetyandrights.org

Date of Publication
January 2018

Price
100 Tk.

Copyright
Safety and Rights Society (SRS)

ISBN: 978-984-34-3483-8

সূচি

	সেইফটি এন্ড রাইটস-এর বক্তব্য	৫
১.	বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি: ২০১৭	৭
২.	জনসংখ্যা ও কর্মসংস্থান চিত্র: শিক্ষিতদের মাঝে বেকারত্বের হার অধিক	১০
৩.	শ্রম অর্থনীতির গতি প্রকৃতি: শ্রমিকদের মজুরি বঞ্চনা ও জাতীয় সম্পদে হিস্যা হ্রাস	১২
৪.	খাতভিত্তিক পর্যালোচনা: গার্মেন্টস, প্রবাসী, চা, নির্মাণ, পাথর ও ইট ভাঙ্গা শ্রমিক	১৮
৫.	শ্রম আন্দোলন ২০১৭: দুটি কেসস্টাডি	২৭
৬.	শ্রম ও কর্মসংস্থান খাত: জাতীয় বাজেট পর্যালোচনা	৩০
৭.	শ্রমজীবীদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা চিত্র ২০১৭	৩৬
৮.	নারী শ্রমিক : যাতায়াতে নিরাপত্তা সংকট ও মজুরি বৈষম্য	৪০
৯.	দেশজুড়ে দলিত শ্রমজীবী: পরিস্থিতি অপরিবর্তিত	৪৩
১০.	কৃষি শ্রমজীবীদের অসহায়ত্ব: হাওরে বাঁধ ভাঙ্গাজনিত সংকট	৪৭
১১.	শ্রম আইন সংশোধন উদ্যোগ : গৃহশ্রমিক ও কৃষিশ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি	৫০
১২.	ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার: চর্চা, বাধা ও বিতর্ক	৫২
১৩.	টম্পাকো দুর্ঘটনা: বেকারত্ব ঘোচেনি চাকুরি হারানো শ্রমিকদের	৫৪
১৪.	সাক্ষাৎকার : শ্রমিক নেতা, কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক, আইনজীবী	৫৬
১৫.	সমগ্র প্রতিবেদনের ইংরেজি সংক্ষিপ্তসার	৬৪

সেইফটি এন্ড রাইটস-এর বক্তব্য

...শিল্প অর্থনীতির বিশ্ব পরিমন্ডলের অংশীদার বাংলাদেশও...

সাধারণভাবে বাংলাদেশের শ্রমজীবীদের অধিকার বিষয়ে এবং বিশেষভাবে তাদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে গত প্রায় এক দশক ধরে কাজ করছে সেইফটি এন্ড রাইটস। শ্রম বিষয়ে গবেষণা, শ্রমিকদের আইনগত সহায়তা দেয়া, শ্রমিকদের মাঝে পেশাগত স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা, শ্রমখাতের দুর্ঘটনা ও ক্ষতিপূরণ বিষয়ে তথ্য সংকলন, ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সাহায্য করা এবং শ্রমিক স্বার্থে বর্ধিত বাজেট বরাদ্দের জন্য জাতীয় পরিসরে প্রচার আন্দোলনের পাশাপাশি সেইফটি এন্ড রাইটস-এর সর্বশেষ একটি উদ্যোগ হলো শ্রম বিষয়ে এই বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রকাশ। এই প্রতিবেদন এখন থেকে প্রতি বছর প্রকাশের ইচ্ছা রয়েছে আমাদের। প্রতি জানুয়ারিতে এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। এর লক্ষ্য হলো, দেশের শ্রম অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে একটি হালনাগাদ চিত্র তুলে ধরা। যা চলতি সময়ে বিশেষভাবে এ কারণেও জরুরি যে, বাংলাদেশ এখন ক্রমে শিল্প অর্থনীতির এক নতুন যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। যদিও এই প্রতিবেদনে প্রধানত বাংলাদেশের বিগত বছরের শ্রম খাতের পরিস্থিতি তুলে ধরা হবে, তবে পরিকল্পনা রয়েছে ক্রমে এতে শ্রম বাজার এবং আয় ও মজুরি সংক্রান্ত জাতীয় প্রবণতাসমূহের ওপরও আলোকপাত করা হবে। মূলত জাতীয় প্রচারমাধ্যমের তথ্য-উপাত্তের আলোকেই এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে।

এটা আমরা জানি যে, শ্রম অর্থনীতির প্রধান দুটি দিক রয়েছে। প্রথমত, এটা শ্রমবাজারে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাকে খতিয়ে দেখে। এক্ষেত্রে মূল ফোকাস থাকে লেবার ফোর্স-এর ওপর। আবার অন্যদিকে, তা শ্রম বাজারের সঙ্গে মুদ্রা বাজার, পণ্যবাজার, বৈদেশিক বাণিজ্য ইত্যাদির আন্তঃসম্পর্কেও নিয়মিত আলোকপাত করে। আপাতত সেইফটি এন্ড রাইটস এই প্রতিবেদনে শ্রম অর্থনীতির প্রথম ধরনের তৎপরতাতেই নিজের মনযোগ নিয়োজিত করেছে। শ্রমিক ও তাদের আয়-রোজগার-নিরাপত্তা-অধিকারের প্রশ্নই এই প্রকাশনায় মুখ্য হিসেবে থাকছে। বিশেষ করে আমরা ২০১৭ সালের প্রতিবেদনে আয়বৈষম্য ও মজুরিচিত্রকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেছি। আর খাতভিত্তিক আলোচনাকালে আমরা দৈবচয়ন আকারে চারটি খাত (গার্মেন্ট, চা, নির্মাণ ও পাথরভাঙ্গা)-এর ওপর বিশেষ মনযোগ দিয়েছি। ধীরে ধীরে পরবর্তী বছরগুলোতে এইরূপ বাৎসরিক প্রতিবেদনে শ্রমশক্তি ও শ্রম অর্থনীতির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়ে এবং অন্যান্য শিল্পখাতের ওপরও বিস্তারিত মনযোগ দেয়া হবে বলে সেইফটি এন্ড রাইটস ইচ্ছা পোষন করছে।

বিভিন্ন গবেষণাসূত্রে এটা অনুমান করা হয় যে, বর্তমানে বাংলাদেশে 'কর্মরত' মোট জনগোষ্ঠী ৫ কোটি ৮০ লাখ। এর মধ্যে হকার, ফেরিওয়ালা, গৃহকর্মী, গাড়িচালক ও সহযোগী, নির্মাণ শ্রমিকের মতো অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মী আছেন হলো ৫ কোটি ৭ লাখ। আর আনুষ্ঠানিক খাতে ৭৩ লাখ মানুষ কাজ করেন। আনুষ্ঠানিক খাতের বড় বড়গুলোতে আবার ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম সীমিত। ফলে সহজেই অনুমেয়, সমগ্র কর্মজীবীদের অতি নগণ্য সংখ্যকের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার রয়েছে দেশে। এইরূপ পরিস্থিতিতে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ককে পুরানো সামন্ততান্ত্রিক ধরন থেকে আধুনিক শিল্প-অর্থনীতির ধারায় স্থাপন করা গেছে সামান্যই। শিল্প পরিসরে টেকসই অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য মালিক-শ্রমিক-সরকার মিলে যে একটি ত্রিপক্ষীয় সুষ্ঠু পরিবেশ প্রয়োজন এই বোধ এখনও বাংলাদেশের শ্রম অর্থনীতিতে খুবই দুর্বল। ফলে পেশাগত স্বাস্থ্য, মজুরি, নিরাপত্তা, সংগঠিত হওয়ার অধিকারের দুর্বলতার মাঝে শ্রমজীবির জীবন থাকে খুবই নাজুক এবং তার প্রবল ছাপ থাকে সমাজে এবং বিশেষভাবে শ্রম অর্থনীতিতে। সেইফটি এন্ড রাইটস এই পরিস্থিতিতে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য কাজ করছে। এই প্রকাশনাও সেই লক্ষ্যেই প্রকাশিত।

আমরা আশা করবো আসন্ন দিনগুলোতে বাৎসরিক শ্রমচিত্র আরও ইতিবাচক অভিজ্ঞতায় ভরে উঠবে। যা

বাংলাদেশের কোটি কোটি শ্রমজীবীর পাশাপাশি দেশের বৈশ্বিক ভাবমূর্তির জন্যও জরুরি। আমরা মনে করি, শিল্প অর্থনীতির বিশ্ব পরিমন্ডলের অংশীদার বাংলাদেশও। বাংলাদেশের শ্রম আইন ও সংবিধান এবং বিশ্বজুড়ে কার্যকর আইএলও সনদগুলোর আলোকে একটি টেকসই, শিল্প অর্থনীতির জন্য সহায়ক, শ্রমিক-মালিক-সরকারের জন্য win-win শ্রম পরিবেশের স্বপ্ন দেখে সেইফটি এন্ড রাইটস।

সর্বশেষ এও উল্লেখ করছি যে, এই প্রতিবেদন প্রণয়নে গবেষক আলতাফ পারভেজ সেইফটি এন্ড রাইটসকে বিশেষ সহায়তা করেছেন। সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ।

মো. সেকেন্দার আলী মিনা
নির্বাহী পরিচালক

১ বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি ২০১৭

বাংলাদেশের শ্রম অধিকার চিত্র ২০১৭ সালেও খুব বেশি উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না। শ্রমখাত থেকে শ্রমিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যত সংবাদ পাওয়া গেছে এ বছর তার মধ্যে ইতিবাচক বিষয় ছিল অতি স্বল্প। দুর্ঘটনা, মজুরি বঞ্চনা, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারহীনতা, গ্রেফতার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং শ্রমজীবীদের অধিকার বিষয়ে জাতীয় রাজনীতিতে নীরবতাই ছিল এ বছরের মূল বৈশিষ্ট্য। আন্তর্জাতিক শ্রম মানদন্ড অনুযায়ী বাংলাদেশের শ্রম খাত বহু আগে থেকেই নানাভাবে পিছিয়ে আছে। তবে ২০১৭ সালে সেক্ষেত্রে অগ্রগতির দৃঢ় চেষ্টাও লক্ষ্য করা গিয়েছে কম।

ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন বা আইটিইউসি এ বছর তার বৈশ্বিক রিপোর্টে বলেছে, শ্রমিক অধিকারের বিবেচনায় বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ ১০টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের নাম রয়েছে। আলোচ্য ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ছাড়াও ছিল কলাম্বিয়া, মিসর, গুয়াতেমালা, কাজাখস্তান, ফিলিপিন্স, কাতার, দক্ষিণ কোরিয়া, তুরস্ক ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। 'আইটিইউসি গ্লোবাল রাইটস ইনডেক্স ২০১৭' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়, শ্রমিক হত্যা, ইউনিয়ন করতে না দেওয়া, আন্দোলন দমনে কঠোর মনোভাব, অনিরাপদ কর্মপরিবেশের মতো বিষয়ের কারণে বাংলাদেশ শ্রমিকদের জন্য মোটেই নিরাপদ নয়। ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের ওপর সরকার ও নিয়োগকর্তার চাপিয়ে দেওয়া অব্যাহত ভোগান্তির কারণে বাংলাদেশ র‍্যাটিংয়ে ৫ পেয়েছে, যার অর্থ– শ্রমিকদের 'অধিকারের কোনো নিশ্চয়তা নেই'। ভারত, পাকিস্তান ও মায়ানমারও র‍্যাটিং ৫ পেয়েছে; এক্ষেত্রে নেপাল ও শ্রী লংকা ভাল অবস্থানে রয়েছে। এই দুটি দেশের র‍্যাটিং ৩, যার অর্থ 'সেখানে নিয়মিত অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা নেই'।

২০১৬ সালের এপ্রিল থেকে ২০১৭-এর মার্চ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আইটিইউসি'র উপরোক্ত প্রতিবেদনটি তৈরি করে। প্রতিবেদনে ১৩৯টি দেশের শ্রম অধিকার পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে।

প্রতিবেদনে শ্রম অধিকার বাস্তবায়নে একটি দেশের সার্বিক অবস্থান তুলে ধরতে সর্বনিম্ন ১ থেকে সর্বোচ্চ ৫ নম্বর দেওয়া হয়েছে। একটি দেশ ৫ নম্বর পেলে ধরে নেওয়া হয়েছে সেখানে শ্রম অধিকার বলতে কিছু নেই। আর ১ নম্বর পাওয়ার অর্থ হলো ওই দেশে শ্রমিকেরা মোটা দাগে সব ন্যায্য অধিকার পাচ্ছেন। প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে পদ্ধতিগতভাবে এবং ব্যবহারিক পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন বিরোধী বৈষম্য বিরাজমান রয়েছে। আইটিইউসি বলছে, '২০১৭ সালের জানুয়ারির শুরুতে (বাংলাদেশ সরকার) এক হাজার ৬০০ জনের বেশি শ্রমিক বরখাস্ত করেছে এবং ৬০০ শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতার বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয়েছে।'

এদিকে ২০১৭-এর জুনে জেনেভায় আইএলও'র সম্মেলনে বলা হয়েছিল, বাংলাদেশে শ্রম অধিকার উন্নতির স্বার্থে সংগঠিত হওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি ট্রেড ইউনিয়ন বিরোধী বৈষম্যমূলক আচরণ ও সহিংসতা বন্ধের জন্য ২০১৭-এর নভেম্বর মাসের মধ্যে সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকার কী কী করেছে, তা নিয়ে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) বিশেষজ্ঞ কমিটিকে ওই সময়ের মধ্যে বিস্তারিতভাবে জানাতে বলা হয়।

আইএলও যেসব ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখতে ইচ্ছুক তার মধ্যে রয়েছে: সংগঠিত হওয়ার অধিকারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বিধিমালা আন্তর্জাতিক সনদের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হওয়াটা নিশ্চিত করা; খসড়া ইপিজেড আইনে সংগঠিত হওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা; আশুলিয়াসহ বিভিন্ন এলাকায় ইউনিয়ন বিরোধী কর্মকান্ডের তদন্ত করে চাকুরিচ্যুত হওয়া লোকজনের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়া; আইন অনুযায়ী অভিযুক্তদের কাছ থেকে আর্থিক জরিমানা আদায় কিংবা মামলা দায়ের করা এবং দ্রুততার সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন করা। আইএলওর আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন (আইএলসি) শেষে প্রচারিত সনদ বাস্তবায়ন ও সুপারিশ বিষয়ক প্রতিবেদনে এসব কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশের শ্রম খাতে এ বছর আরেকটি ঘটনা ছিল পোশাক খাতের শ্রম অধিকার বিষয়ে 'অ্যাকর্ড'-এর দ্বিতীয় মেয়াদেও (২০২১ পর্যন্ত) কাজ করতে চাওয়া এবং তার বিরুদ্ধে কারখানা মালিকদের সংগঠন ও সরকারের অবস্থান।

বাংলাদেশ থেকে যেসব আন্তর্জাতিক ক্রেতা প্রতিষ্ঠান তৈরি পোশাক কেনে তাদের অন্যতম জোট 'অ্যাকর্ড' পোশাক শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে কাজ করতে চাওয়ার পর তাতে আপত্তি তোলে সরকার ও গার্মেন্টস মালিকরা। ২০১৭ সালের জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে এই ঘটনা ঘটে। গার্মেন্টস কারখানাগুলোর শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে অ্যাকর্ড কাজ করতে চাইলে এতে আপত্তি জানিয়ে বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বিবিসিকে বলেছেন, শ্রমিকের অধিকার দেখার দায়িত্ব অ্যাকর্ডের নয়, এজন্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক সংস্থা আইএলও। তবে অ্যার্কডের সঙ্গে চুক্তবদ্ধ আছে যেসব ব্র্যান্ড ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠান তাদের মধ্যে ২৪টি ব্র্যান্ড ইতোমধ্যে অ্যাকর্ডের পরবর্তী দফা কার্যক্রমের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। বাকি ব্র্যান্ডগুলোর সম্মতির জন্য চেষ্টা করছে আন্তর্জাতিক অনেক শ্রমিক অধিকার সংস্থা– যেমন, ইন্ডাস্ট্রিঅল, ক্লিন ক্লথ ক্যাম্পেইন ইত্যাদি। এই প্রতিবেদন তৈরির সময় পর্যন্ত এই মর্মে সাধারণ ঐক্যমত ছিল যে, অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স দ্বিতীয় মেয়াদে দীর্ঘ সময় থাকছে না। ২০১৮ সালেই তাদের কার্যক্রম শেষ হবে যদি এর মধ্যেই এই দুই জোটের কাজ বুঝে নিতে বাংলাদেশ প্রকৌশলগত সক্ষমতা অর্জন করে। অন্যথায় অ্যাকর্ড ছয় মাস করে তার সময় বাড়াবে। একই খাতের উত্তর আমেরিকার ক্রেতাদের জোট 'অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার সেফটি' নির্দিষ্ট সময়ের পর আর বাংলাদেশে নিরাপত্তা বিষয়ে তদারকিতে থাকছে না বলে জানা গেছে। ২০১৭-এর আগস্টে তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি সিদ্দিকুর রহমানকে এক ই-মেইল বার্তায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অ্যালায়েন্সের কান্ট্রি ডিরেক্টর জেমস এফ মরিয়ার্টি। এদিকে অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নেবে শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত 'সংস্কার কাজ সমন্বয় সেল' বা আরসিসি নামক একটি প্রকল্প। ইতোমধ্যে ২০১৭ সালের মাঝামাঝি আরসিসি'র উদ্বোধন হলে বছর শেষেও তার মূল কার্যক্রমে গতি আসেনি।

অন্যদিকে, ২০১৭-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে লেখা এক চিঠিতে মার্কিন কংগ্রেসের ১১ সদস্য বলেছে, শ্রম অধিকারের প্রতি সম্মান বিবেচনায় ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছে বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রীকে

একটি ইতিবাচক সংবাদ

২০১৭ সালে শ্রম খাতের একটি ইতিবাচক সংবাদ ছিল শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে অর্থ জমা দান শুরু হওয়া। বর্তমান শ্রম আইনে এইরূপ বাধ্যবাধকতা রয়েছে যে, কোন কোম্পানির মূলধন ২ কোটি টাকার বেশি অথবা মোট সম্পদ ৩ কোটি টাকার অধিক হলে বছর শেষে তারা যে মুনাফা ঘোষণা করে তার ৫ শতাংশ শ্রমিক কল্যাণে ব্যয় করতে হবে। এই ৫ শতাংশের এক দশমাংশ প্রদান করতে হবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন গঠিত শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে। ২০১৩ সালে এই তহবিলে অর্থ জমা শুরু হলেও ২০১৭ সালে এসে তা বিশেষ বেগবান হয়। সর্বশেষ এই তহবিলের আকার দাঁড়িয়েছে ২৫০ কোটি টাকা এবং দেশি-বিদেশী মালিকানাধীন প্রায় ৯৪টি প্রতিষ্ঠান এখানে অর্থ জমা দেয়া শুরু করেছে।

দেয়া চিঠিতে স্বাক্ষরকারীরা কংগ্রেস সদস্যরা হলেন– জ্যান স্কাভোস্কি, স্যান্ডার লেভিন, বিল পাসক্রেল, ববি স্কট, জেমস পি. ম্যাকগভার্ন, মার্ক পোকান, উইলিয়াম কিয়াটিং, জ্যাকি স্পেইয়ার, জোসেফ ক্রাউলি, স্টিভ কোহেন ও বারবারা লি। এ চিঠির অনুলিপি দেয়া হয়েছে তৈরি পোশাকের ক্রেতা প্রতিষ্ঠান বার্কশায়ার হাথাওয়ে, কার্টার্স, গ্যাপ আইএনসি, এইচঅ্যান্ডএম, জেসি পেনি কোম্পানি, কোহল'স, পিভিএইচ, সিয়ার্স হোল্ডিং করপোরেশন, টার্গেট, ভিএফ করপোরেশন এবং ওয়ালমার্টকে। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, 'পোশাক শিল্পে শ্রম অধিকার নিয়ে শান্তিপূর্ণ কর্মকান্ডে নিয়োজিত নেতাদের গ্রেফতার ও আটকের ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশে। দেশটির বন্ধু ও যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশের শক্তিশালী সম্পর্কের সমর্থক হিসেবে এ বিষয়ে আমরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি।'

এদিকে ২০১৭ সালের ২৭ মার্চ ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে দেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় (ইপিজেড) কর্মরত শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করতে বলেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) প্রতিনিধিদল। এ জন্য ইপিজেডে শ্রম আইন বাস্তবায়ন চায় তারা। ট্রেড ইউনিয়নের স্বাধীনতা নিশ্চিত ও নিবন্ধন-প্রক্রিয়া সহজ করতে শ্রম আইন সংশোধনেরও

তাগিদ দিয়েছে প্রতিনিধিদল। তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে সফররত ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রতিনিধিদল এসব কথা বলে। রাজধানীর ওয়েস্টিন হোটেলে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৭ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদলের উপরোক্ত সফরের সময় বিভিন্ন সূত্রে এও জানা যায় যে, বাংলাদেশের শ্রম অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলে জিএসপি-সুবিধার বিষয়টি খতিয়ে দেখারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইইউ। শ্রম অধিকারের বিষয়গুলো খতিয়ে দেখতেই ঢাকায় এসেছেন ইইউ পার্লামেন্টের সদস্যরা। তবে সফরকালে জিএসপির বিষয়ে কোনো কথা বলেননি প্রতিনিধিদলের নেতা আর্নে লেইতজ।

এদিকে পুরো বছরজুড়ে পোশাক খাতের শ্রমিক সংগঠনগুলো ১০ হাজার টাকা বেসিকসহ ১৬ হাজার টাকা সর্বনিম্ন মজুরির দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যায়। আবার অভূতপূর্বভাবে পোশাক মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ'র সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান পোশাক শ্রমিকদের মজুরি পুনর্নির্ধারণের বিষয়ে মজুরি বোর্ড গঠনের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন এ বছরের শেষার্ধে।

২০১৭ সালে শ্রম খাতের আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কর্মসংস্থান সংকট। সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপে দেশে প্রায় ২৬ লাখ বেকারের তথ্য জানানো হয়। এর মধ্যে বিশেষ উদ্বেগের বিষয় ছিল উচ্চশিক্ষিতদের মাঝে বেকারত্বের অধিক হার। এ বিষয়ে বর্তমান প্রতিবেদনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। ক্রমবর্ধনমান আয়বৈষম্যের বিষয়টি নিয়েও এ বছর অর্থনীতিবিদদের উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা গেছে। এ বছর (ইউএনডিপি ও পিপিআরসি কর্তৃক) প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, আর্থিকভাবে দেশের শীর্ষ স্তরে থ াকা ১০ শতাংশ জনসংখ্যার কাছে জাতীয় আয়ের ৪৬.২ শতাংশ পুঞ্জিভূত হয়ে পড়েছে। বর্তমান প্রতিবেদনের তৃতীয় অধ্যায়ে এই বিষয়ে আরও সমকালীন তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরা হয়েছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির মুখেও এবং প্রবৃদ্ধিসম্পন্ন শিল্পখাতগুলোতেও শ্রমজীবীদের জরুরি প্রয়োজনগুলোর প্রতি কীরূপ অবহেলা ঘটছে এবং তারা কীরূপ সংকটে রয়েছে সে বিষয়ে এই প্রতিবেদনে খাতভিত্তিক আলোচনা রয়েছে চা, চামড়াসহ কয়েকটি সেক্টর নিয়ে। এক্ষেত্রে চামড়া খাতে শ্রমিক আন্দোলনের পটভূমি এবং সর্বশেষ অবস্থাও তুলে ধরা হয়েছে। জাতীয় বাজেটে শ্রম ও শ্রমিক স্বার্থ কীভাবে প্রতিফলিত হয় এবং এক্ষেত্রে শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া কি ছিল সে বিষয়ে ষষ্ঠ অধ্যায়ে অনুসন্ধানী আলোচনা রয়েছে। এরপরই শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে সর্বশেষ বছরের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষ ঘটনা হিসেবে টম্পাকো কারখানার দুর্ঘাটনার পূর্বাপর পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া গ্রামীণ কৃষি শ্রমিক এবং নারী শ্রমিকদের সর্বশেষ পরিস্থিতির উপরও পৃথক পৃথক অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অন্যতম শ্রমজীবী জনগোষ্ঠী হিসেবে দলিতদের সংকটকেও এই প্রতিবেদনে যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া অনিবার্যভাবেই এসেছে দেশের ট্রেড ইউনিয়ন পরিস্থিতি। সর্বশেষ সরকার শ্রম আইন সংশোধনের যে উদ্যোগ নিয়েছে সে বিষয়ে শ্রমিক ইউনিয়ন ও শ্রম বিশেষজ্ঞদের অভিমতও তুলে ধরা হয়েছে দুটি অধ্যায়ে পৃথকভাবে।

২

জনসংখ্যা ও কর্মসংস্থান চিত্র

শিক্ষিতদের মাঝে বেকারত্বের হার অধিক

২০১৭ সালের মে মাসে প্রকাশিত ২০১৫-১৬ সালের কোয়াটারলি লেবার ফোর্স সার্ভে অনুযায়ী বাংলাদেশের তখনকার জনসংখ্যা (১৫ কোটি ৮৫ লাখ)-এর ৩৩ শতাংশই ১৪ বছরের কম বয়সী। এইরূপ পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশকে বলা হয়, 'তরুণদের দেশ।' ফলে কর্মসংস্থান সুবিধার প্রসার বাংলাদেশে এখন সবচেয়ে জরুরি এক প্রশ্ন। অন্যদিকে, বাংলাদেশে ৬৫-উর্ধ্ব জনসংখ্যা ৪.৭ শতাংশ। ১৪ বছরের নীচে এবং ৬৫-উর্ধ্ব জনসংখ্যা সম্মিলিতভাবে প্রায় ৩৮ শতাংশ। অর্থাৎ ১৫-৬৪ বয়সী (working age population) জনসংখ্যা প্রায় ৬২ শতাংশ।

উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে লক্ষণীয়, কাজ করতে সামর্থ্যবানদের ওপর কাজ করতে অসমর্থদের নির্ভরতা চিত্র ভয়ানক। প্রতি ১০০ জনে– কর্ম-সক্ষম জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হলো কর্ম-অনুপযোগী জনসংখ্যা। নির্ভরশীল জনসংখ্যার এই অধিক হারও কর্মক্ষমদের জন্য কর্মসংস্থানের জরুরি প্রয়োজনীয়তাকে উর্ধ্বে তুলে ধরছে। ভবিষ্যতে যেহেতু গড় আয়ু আরও বাড়বে সুতরাং কর্মজীবীদের উপর বয়স্ক নিকটজনকে দেখার দায় আরও বাড়বে।

কিন্তু দেশে কর্মসংস্থানের চিত্র ২০১৭ সালেও আশানুরূপ ছিল না। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে উদ্বৃত করে দৈনিক প্রথম আলোর ২০১৭ সালের ২৯ মে'র এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, 'এক দশক আগে দেশে প্রতি বছর গড়ে প্রায় সাড়ে ১৩ লাখ কর্মসংস্থান বাড়তো, এখন তা কমে বছরে ৯ লাখ ৩৩ হাজারে নেমে এসেছে।' অর্থাৎ মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি'র) প্রবৃদ্ধি গত এক দশকে ৬ শতাংশ থেকে প্রায় ৭ শতাংশে উত্তরণ ঘটলেও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তার ইতিবাচক প্রভাব কমই দেখা যায়।

পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য থেকে এও লক্ষ্যণীয়, ১৫ থেকে উর্ধ্ব বয়সী জনসংখ্যা গত দশকে বছরে ৩.৩ শতাংশ আকারে বেড়েছে। যা ২০১৫ সালে ছিল প্রায় ৫ কোটি ৯০ লাখ। ২০১৬ সালে হয়েছে ৬ কোটি ২১ লাখ। এর

আমাদের শ্রম বাজারে প্রতি বছর ২০ লাখ শ্রমশক্তি যুক্ত হচ্ছে
- বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী, ১ জুন ২০১৭

মধ্যে 'কাজে রয়েছেন' বা 'অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে যুক্ত' ব্যক্তির সংখ্যা ৩ কোটি ৮০ লাখ। এদের মূল অংশ (৩৩ শতাংশ) কৃষিতে যুক্ত নানারূপ শ্রমিক। 'কাজ' দেয়ার ক্ষেত্রে দেশে এখনও কৃষির স্থানই সর্বোচ্চ। প্রায় ৪২.৭ শতাংশ কর্মসংস্থান হচ্ছে কৃষি থেকে। যদিও জাতীয় আয়ে কৃষির হিস্যা বর্তমান মাত্র ১৫ শতাংশ। কর্মসংস্থানে কৃষির পরেই অবস্থান সার্ভিস সেক্টরের, ৩৬.৯ শতাংশ। 'শিল্প' এক্ষেত্রে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে 'কাজে রয়েছেন' এমন জনসংখ্যার ৮৬.২ ভাগই নিয়োজিত অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে। উল্লেখ্য, দেশে গ্রাম ও শহরে জনসংখ্যা হিস্যা বর্তমানে ৭০:৩০। আর সর্বশেষ লেবার ফোর্স সার্ভে অনুযায়ী গ্রাম ও শহরে বেকারত্বের তুলনা হলো ১৮.২ লাখ : ৭.৭ লাখ।

সদ্য বিগত দশকগুলোতে শিল্প বাংলাদেশে নীতিনির্ধারকদের সবচেয়ে বেশী মনযোগ পেলেও– শিল্পে সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ দেয়া পোশাক খাত ক্রমে অধিকতর যন্ত্রায়িত ও প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে পড়ায় সেখানে আগের মতো আর শ্রমিকদের কাজের সুযোগ ঘটছে না। ২০১৭ সালের ১৩ মার্চ ঢাকায় সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্স এন্ড এমপ্লয়মেন্ট আয়োজিত এক

সেমিনারে গবেষক রুশিদান ইসলাম রহমান দেখিয়েছেন, ২০১৩-এর পর থেকে পোশাক খাতে কর্মসংস্থান স্থবির হয়ে আছে।

আবার ভিন্ন বিবেচনায় ৮৬ শতাংশের বেশি কর্মসংস্থান হচ্ছে অনানুষ্ঠানিক খাতে এবং মাত্র ১৩.৮ শতাংশ লোক অর্থনৈতিকভাবে যুক্ত হতে পেরেছেন আনুষ্ঠানিক খাতে। শ্রম আইনের সুরক্ষা থেকে অনানুষ্ঠানিক খাতের বিরাট অংশ যেমন বাদ পড়ে আছে তেমনি আনুষ্ঠানিক খাতেরও বহু শিল্পে শ্রম আইনের বাস্তবায়ন অঘোষিতভাবে নিষিদ্ধ। ফলে কর্মসংস্থান মাত্রই এখানে কম মজুরি ও অসংগঠিত থাকার এক ধরনের স্থায়ী নাজুকতাও বটে। এইরূপ বিবেচনা থেকেই ২০১৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বিবিসি-বাংলাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে অর্থনীতিবিদ মোস্তাফিজুর রহমান বলেছেন, বাংলাদেশে পরিসংখ্যানে যাদের 'কাজ আছে' ধরা হয় তাদেরও চার ভাগের এক ভাগের কাজটি নিয়মিত হয়।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিল অনুযায়ী শতকরা হিসাবে মোট কর্মসংস্থানের ৪৭.৩০ ভাগ কৃষি-মৎস্য-বনজ খাতে হচ্ছে। এরপরই হোটেল রেঁস্তোরা খাতের অবস্থান, প্রায় ১৫.৫৩ শতাংশ। দেশে কারখানা সংশ্লিষ্ট কর্মসংস্থান মাত্র ১২.৩৪ শতাংশ। এছাড়া পরিবহন ও নির্মাণ খাত যথাক্রমে ৭.৩৯ এবং ৪.৭৯ শতাংশ কর্মসংস্থানের উৎস।

অর্থমন্ত্রী এ এম এ মুহিত ২০১৭ সালের বাজেট উত্থাপনকালে বলেছেন, (বাজেট বর্ক্তৃতা, পৃ. ৩৬) 'আমাদের শ্রম বাজারে প্রতি বছর ২০ লাখ শ্রমশক্তি যুক্ত হচ্ছে। আর প্রতি বছর গড়ে ৪ লাখ শ্রমিক বিদেশ যাচ্ছে কাজের জন্য। অর্থাৎ বছরে ১৬ লাখ নতুন কর্মসংস্থান দরকার দেশে।'

বর্তমানে বাংলাদেশের শ্রমশক্তি জরিপে 'অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে যুক্ত' ব্যক্তি বলতে জরিপকালে সপ্তাহে অন্তত এক ঘন্টা কাজে যুক্ত ব্যক্তিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এইরূপ অতি উদার মানদন্ড সত্ত্বেও বিবিএস-এর ২০১৫-১৬ অর্থবছরের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী দেখা যায়, দেশে বেকারের সংখ্যা ২৬ লাখ– যা ২০১৩ সালে ছিল ২৫ লাখ ৯০ হাজার।

ক্রমে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপশি এও লক্ষ্য করা যাচ্ছে, দেশে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যাই বেশি, প্রায় ৯ শতাংশ। অর্থাৎ প্রতি ১০০ জন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির মাঝে অন্তত ৯ জনের সপ্তাহে এক ঘন্টা কাজেরও সুযোগ মিলছে না। অল্প শিক্ষিতদের মাঝে এই হার তুলনামূলকভাবে কম। কোন ধরনের শিক্ষার সুযোগ মেলেনি এমন কর্মক্ষমদের মাঝে মাত্র ২.২ শতাংশ বেকার। অর্থাৎ পড়াশোনা কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা হয়ে গেছে!

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট রিসার্চ (সিডার) নামের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ২০১৭ সালে তাদের 'কর্মসংস্থান ও শ্রমবাজার পর্যালোচনা' শিরোনামে এক সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলেছে, বাংলাদেশে বেকারত্বের হার উচ্চশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যেই সবচেয়ে বেশি। যার 'শিক্ষাগত যোগ্যতা' যত বেশি, তার চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা তত কম। যারা দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন, তাদের মধ্যে বেকারত্বের হার ৭ দশমিক ৫ শতাংশ। আর যারা অনার্স-মাস্টার্স পাস করেছেন, তাদের মধ্যে বেকারত্বের হার ১৬ দশমিক ৪ শতাংশ। উপরোক্ত সমীক্ষায় আরও একটা লক্ষণীয় তথ্য ছিল এই যে, কম শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে বেকারত্বের হার ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে; কিন্তু বেশি শিক্ষিত ব্যক্তিদের বেকারত্বের হার খুব দ্রুতগতিতে বেড়ে যাচ্ছে।

অন্যদিকে, ঠিক এই সময়েই আইএলও-এর এক প্রতিবেদনে[১] বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশের ৪০ শতাংশ তরুণ 'নিষ্ক্রিয়'। তারা পড়াশোনা করছেন না, আবার কাজও করছেন না। কাজ খুঁজে পেতে কোন প্রশিক্ষণও নিচ্ছেন না। নিষ্ক্রিয় তরুণদের সংখ্যার বিবেচনায় বাংলাদেশ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তৃতীয় খারাপ অবস্থানে রয়েছে।'

আবার ২০১৭ সালের ১২ জানুয়ারি প্রকাশিত আইএলও'র ওয়ার্ল্ড এমপ্লয়মেন্ট সোশ্যাল আউটলুকে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে, ২০১৭ থেকে ২০১৯ এর মাঝে বৈশ্বিক কর্মসংস্থান কমবে বিধায়– তার প্রভাব পড়বে বাংলাদেশেও। অর্থাৎ ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ কর্মসংস্থান বৃদ্ধির চ্যালেঞ্জে থাকবে। আইএলও'র এই প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বে বেকারত্ব বাড়ছে এমন ২০টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ১২তম। তবে বাংলাদেশ সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০১৫-এর জুলাই থেকে ২০২০ এর জুনের মাঝে ১ কোটি ২৯ লাখ নতুন কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে।

তবে ২০ নভেম্বর জাতীয় সংসদে এক প্রশ্নের উত্তরে জনপ্রশাসনমন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম জানিয়েছেন, সরকারি চাকুরিতে প্রবেশের বয়সসীমা আপাতত ৩০-ই থাকছে।

---

[১] http://ilo.org/asia/decentwork/adwd/lang--en/index.htm এবং প্রথম আলো, ২৯ মে 2017|

৩

শ্রম অর্থনীতির গতি প্রকৃতি

শ্রমিকদের মজুরি বঞ্চনা ও জাতীয় সম্পদে হিস্যা হ্রাস

অর্থনীতিবিদ আনু মুহাম্মদ তাঁর এক লেখায় মন্তব্য করেছেন, 'স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে গত প্রায় চার যুগে অর্থনীতির আয়তন বেড়েছে প্রায় ৩০০ গুন।'[২] এই হিসেবে যদিও মুদ্রাস্ফীতির হিস্যাও রয়েছে– কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্রুতবেগেই যে বিকাশমান তা প্রশ্নাতীত। এর বিকাশ ঘটছে এবং এতে সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে বর্ধিত আকারে। কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনও শ্রমনির্ভর। কারণ কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রার আয়– অর্থনীতির এই দুই প্রধান নির্দেশকের ভরকেন্দ্র হয়ে আছে পোশাক শিল্পের শ্রমিক এবং প্রবাসী শ্রমিকদের ভূমিকা। আবার কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও কৃষি, পোশাক শিল্প, প্রবাসী কর্মজগতই মুখ্য ভরসা। অর্থাৎ বাংলাদেশে শ্রমনির্ভর অর্থনীতিকে প্রযুক্তি বা জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তর করা যায়নি। যদিও তার চেষ্টা চলছে। আবার শ্রমিকদের মজুরি পূর্বের দশক থেকে অনেক বাড়লেও মূল্যস্ফীতির কারণে প্রকৃত মজুরি কমে যাচ্ছে এবং সমাজের অন্যান্য পেশার মজুরি বৃদ্ধির তুলনায় শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির হারও অতি কম।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে কমবেশি ৬ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে। যা তার ম্যাক্রো অর্থনীতির স্থিতিশীলতাকে নির্দেশ করছে। গত দুই দশকে বাংলাদেশ উপরোক্ত হারে যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, তা প্রধানত তৈরি পোশাক রপ্তানির জন্য। ১৯৯০ সালে যেখানে তৈরি পোশাকের বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের হিস্যা ছিল মাত্র দশমিক ৬ শতাংশ সেখানে বর্তমানে তা হয়েছে প্রায় ৬ শতাংশ। অথচ এশিয়া অঞ্চলে বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিকেরা সবচেয়ে কম মজুরি পায়। এ ছাড়া এখনও দেশে কোন জাতীয় নিম্নতম মজুরি আইন নেই। পাশাপাশি চাহিদার চেয়ে শ্রমজীবীদের যোগান বেশি থাকায় মজুরি বাজারের ঝোঁক নিম্নমুখী। এ বিষয়ে শ্রমিক সংগঠকরা প্রায় সময়ই উদাহরণ দিচ্ছেন, ১৯৬৯ সালে পাকিস্তান

[২] https://sarbojonkotha.files.wordpress. com/2017/02/7-10-arthoniti.pdf

পিপিআরসির গবেষণা

মাথাপিছু গড় আয়

■ সবচেয়ে ধনী	১০ শতাংশ	৪৯৬২ ডলার
■ সবচেয়ে গরিব	৪০ শতাংশ	৩৫৯ ডলার
■ মাঝামাঝি	৪০ শতাংশ	৮৬৭ ডলার
■ রাজধানীর ধনী	১০ শতাংশ	১১৭৯১ ডলার

সরকার গঠিত নূর খান কমিশন জাতীয় ন্যূনতম মজুরী ঘোষণা করেছিল ১৫৫ টাকা। তখন চালের মণ ছিল ৩০ টাকা। পাকিস্তান আমলের একজন শ্রমিক ১৫৫ টাকা ন্যূনতম মজুরীতে পাঁচ মণ চাল কিনতে পারলেও ২০১৭ সালে পোশাক খাতের ন্যূনতম মজুরী (পোশাক শিল্পে) ৫ হাজার ৩০০ টাকা দিয়ে ২ মণের বেশি চাল কিনতে পারবে না। অর্থাৎ জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে যাদের অবদান বেশি, তাদের আয় কম এবং জাতীয় সম্পদেও তাদের হিস্যা কম। ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি ও গড় আয় বাড়লেও আয় ও সম্পদ বণ্টনে প্রবল বৈষম্য দেখা দিচ্ছে। অর্থনীতিবিদ মইনুল ইসলাম বলেছেন[৩], দেশের ১০ শতাংশ ধনী ব্যক্তি দেশের ১০ শতাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠী (যাদের অধিকাংশই শ্রমজীবী)-এর ১৮ গুন বেশি আয় ও সম্পদের মালিক। অন্যদিকে, পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান ড. সাদিক আহমদ বলেছেন সর্বোচ্চ স্তরের ৫ শতাংশ জনসংখ্যার কাছে জাতীয় আয়ের ২৫ শতাংশের মালিকানা পুঞ্জিভূত হয়েছে। অন্যদিকে শ্রমজীবীদের জীবনে এক বড় সমস্যা মূল্যস্ফীতি। মূল্যস্ফীতির কারণে শ্রমজীবীরা সঞ্চয়ও করতে পারছে না। মূল্যস্ফীতি যে হারে বাড়ছে সেই তুলনায় মানুষের মজুরি বাড়েনি। মজুরি যা বেড়েছে, তা মূল্যস্ফীতির তুলনায় কম। ফলে প্রকৃত মজুরি কমছে। গার্মেন্ট শ্রমিকদের সর্বশেষ বেতন বেড়েছিল চার বছর আগে। কিন্তু প্রতি বছরই ৫ থেকে ১০ শতাংশ হারে

[৩] মইনুল ইসলাম, প্রবৃদ্ধির হার বাড়ছে কিন্তু বৈষম্য কমছে না, ১৭ মে ২০১৬, প্রথম আলো, ঢাকা।

সূত্র: প্র. আ.

মূল্যস্ফীতি বেড়েই চলছে। এভাবে ধারাবাহিকভাবে মূল্যস্ফীতি বাড়ার কারণেই শ্রমজীবীদের প্রকৃত মজুরি কমে গেছে। কনজুমার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)-এর ভাষ্য মতে ২০১৫ সালে দেশে মূল্যস্ফীতি ছিল ৬.২ শতাংশ, ২০১৬ সালে ছিল ৬.৪৭ শতাংশ এবং ২০১৭ সালে বাজেট উত্থাপনকালে অর্থমন্ত্রী তা ৫.৩৯ শতাংশ দাবি করেছেন। যদিও চাল, বিদ্যুত ও গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির কারণে তা আরও বেশি হওয়ার কথা। বিশেষত শ্রমিকরা দাবি করেছেন, বাসা ভাড়া ও চালের মূল্য বৃদ্ধির কারণে তারা প্রাপ্ত আয়ে আর কোনভাবেই চলতে পারছে না।

সর্বশেষ তিন বছরে গড়ে যদি ৬ শতাংশ মূল্যস্ফীতিও হয়ে থাকে তাহলেও ২০১৫ সালে নির্ধারিত চিংড়ি খাতের ন্যূনতম মজুরি ৪ হাজার ৪১৯ টাকার প্রকৃত অংক ২০১৭ সালে দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ৯৩২ টাকা। একইরূপ হিসাবে ২০১৩ সালে নির্ধারিত গার্মেন্ট খাতের ন্যূনতম মজুরি ৫ হাজার ৩০০ টাকা প্রকৃত মজুরি রূপে ২০১৭-এ দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ১৯৮ টাকা। বস্তুত এইরূপ পরিস্থিতিতে মজুরি বৃদ্ধির চেয়েও শ্রমিকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি। লক্ষ্যণীয় যে, মোটা চালের মূল্য যেখানে ২০১৫-১৬ সালে ছিল ৩৩ টাকা, ২০১৭ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৬৫-৭০ টাকা। অর্থাৎ এক বছরেই প্রায় এক শত শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে এক্ষেত্রে। ২০১৭ সালে চাল ছাড়াও দাম বেড়েছে অন্যান্য পণ্যেও।

এদিকে ২০১৭-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে[৪] দেখা গেছে, যদিও দেশে ইতোমধ্যে ৪২টি পেশায় ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হয়েছে–কিন্তু এখনো অন্তত ৫৮টি সুপরিচিত শিল্পখাতে ন্যূনতম মজুরিই ঘোষণা বাকি রয়েছে। আবার সাধারণত ৫ বছর পর পর একটি খাতের ন্যূনতম মজুরির পুনর্বিবেচনার কথা থাকলেও–তাও করা হয় খুব কম ক্ষেত্রে। এমনও খাত রয়েছে–(যেমন, পেট্রোল পাম্প শ্রমিক) যেখানে ১৯৮৭ তে সর্বশেষ ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হয়।

যে জিডিপি কর্মসংস্থান তৈরি করছে না

বাংলাদেশের অর্থনীতির অতিসাম্প্রতিক একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এক দশক ধরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীল হলেও তা স্বল্পপ্রবৃদ্ধির চক্রে আটকে আছে। কমবেশি ৬-৭ শতাংশ হারে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ঘটছে। যদিও সরকারি তরফ থেকে সর্বশেষ টার্গেট নির্ধারিত হয়েছে ৭-৭.৫ শতাংশ। চলমান প্রবৃদ্ধির একটি বিশেষ দিক হয়ে উঠেছে এতে প্রত্যাশিত কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে না। বছরে গড়ে প্রায় ২০ লাখ কর্মক্ষম মানুষ গত দুই দশক ধরে শ্রমশক্তিতে যুক্ত হলেও গত ১০ বছরে গড়ে মাত্র দুই লাখ করে মানুষের আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান হয়েছে। ফলে বিপুল বেকারের উপস্থিতি হেতু শ্রমজীবীরা মজুরি ও কাজের পরিবেশ নিয়ে দরকষাকষি করতে পারছে না। অর্থনীতির চলিত ধারা শুধু যে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করছে না তাই নয়– সেটা কম উৎপাদনশীল স্থান থেকে শ্রমিকদের অধিকতর উৎপাদনশীল স্থানে স্থানান্তরও ঘটাচ্ছে অতিক্ষীণ। জিডিপি ও কর্মসংস্থানের এই বিপরীতমুখী চিত্র সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। প্রবৃদ্ধির দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে– তার সুফল সমাজের সকল শ্রেণী-পেশায় সুষমভাবে বন্টিত হচ্ছে না এবং এইরূপ বন্টনের জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগও সীমিত।

কম উৎপাদনশীলতা–প্রশিক্ষণহীনতা

অধিকতর উন্মুক্ত ও বাজারমুখী অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ ক্রমাগত নানান পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে। কিন্তু বাংলাদেশে শিল্পোদ্যোগের প্রধান বাধাগুলোর একটি যে দক্ষ শ্রমিকের অভাব সেই পরিস্থিতি বিগত বছরও অব্যাহত ছিল। বাংলাদেশের ব্যবসায়ী-শিল্পপতি ও উদ্যোক্তাদের একটি পরিচিত অনুযোগ হলো তারা প্রয়োজনীয়সংখ্যক দক্ষ জনবল পান না। শ্রমশক্তি বিষয়ে সুপরিচিত গবেষক ড. রুশিদান ইসলাম রহমান ২০১৭ সালের ১৮ মে

[৪] সর্বজনকথা, ৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, আগস্ট-অক্টোবর ২০১৭।

দৈনিক বণিক বার্তায় লিখেছেন, '২০২৫ সালে মোট ৭ দশমিক ২ মিলিয়ন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ শ্রমশক্তি প্রয়োজন হবে বাংলাদেশের। কিন্তু শ্রমশক্তির জন্য উন্নততর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা বরাবরের মতোই অপ্রতুল রয়ে গেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের সুবর্ণজয়ন্তিতে ২০২১ সালে পোশাক রপ্তানি পাঁচ হাজার কোটি ডলারে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে বিজিএমইএ। এ জন্য প্রতিবছর এ খাতে ১২.২৫ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি প্রয়োজন।

শিল্পের উদ্যোক্তারা বলছেন, আগামী বছরগুলোতে এ পরিমাণ রপ্তানি আয় অর্জন করতে হলে নতুন করে দুই থেকে তিন লাখ দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হবে। তার যোগান কীভাবে হবে সে বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যায় না। যদিও শিক্ষার অগ্রগতির কারণে এখন শ্রমিকদের মাঝে শিক্ষার হার বেড়েছে–কিন্তু কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রমিক সংখ্যা বর্তমানে হাজারে একজন মাত্র। মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাত্র ২.৪৩ শতাংশ ভকেশনাল ও টেকনিক্যাল বিষয়ে ভর্তি হয়। চীনে এই হার ১৮.৪১ শতাংশ এবং মালয়েশিয়ায় ৬.৩১ শতাংশ।

এ বিষয়ে উপরে উল্লিখিত লেখায়[৫] রুশিদান ইসলাম রহমান একটি 'দুষ্টচক্র'-এর সন্ধান দিয়েছেন এভাবে: বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে দৃশ্যমান প্রবণতা হচ্ছে, এইচএসসিতে যারা খারাপ গ্রেড পায়, যা বিশ্ববিদ্যালয়ে/কলেজে উচ্চশিক্ষায় ভর্তির জন্য যথেষ্ট নয়, তারাই কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়। কিন্তু তাদের দুর্বল শিক্ষাগত পটভূমি প্রশিক্ষণে ভালো করার পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড়ায়। আর যাদের স্কুল শিক্ষার অর্জন আরো কম, অর্থাৎ এসএসসি পাস করতে পারেনি বা আরো আগের শ্রেণীতেই ঝরে পড়েছে, তাদের অবস্থা আরো করুণ। তাদের অনেকেই নিম্ন আয়ের পরিবার থেকে আসছে। তারা স্কুল শিক্ষার সঙ্গে প্রাইভেট শিক্ষকের বা মা-বাবার কাছ থেকে সহায়তা পায় না। তাদের জন্য একটি চাপ থাকে শ্রমবাজারে প্রবেশ করার এবং পরিবারের উপার্জন বাড়ানোর। তারা দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সময় ও অর্থ বিনিয়োগ করার সময়ই পায় না। ফলে নিম্ন মজুরির কাজেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাদের। এভবেই একটি দুষ্টচক্র তৈরি হয়। অথচ অর্থনীতির বিকাশ এবং শ্রমিকের আয় বৃদ্ধির জন্য উৎপাদনশীলতার নবায়ন জরুরি বিষয় বটে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উৎপাদনশীলতা নিয়ে আলোচনা সচরাচর কম হয়। সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে একই পরিমাণ কাঁচামাল বা উপাদান দিয়ে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি কিংবা আগের চেয়ে কম উপাদান দিয়ে সমপরিমাণ পণ্য উৎপাদনই হলো উৎপাদনশীলতা। উৎপাদনশীলতার গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটিই হলো শ্রমিক। তাই উৎপাদনশীলতা বলতে প্রথমেই বোঝানো হয় শ্রম উৎপাদনশীলতা। শ্রমিক নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাঁচামাল ব্যবহার করে যা উৎপাদন করে তাই শ্রম উৎপাদনশীলতা। সমপরিমাণ উপাদানে একই সময়ে শ্রমিক গুণগত মান বজায় রেখে বেশি উৎপাদন করলে তা হবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। যদিও সম্প্রতি প্রতি বছর ২ অক্টোবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস হিসেবে পালন হচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের কাছে উৎপাদনশীলতার বিষয়টি তেমন গুরুত্ব পায়নি। কারণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশ সস্তা শ্রমের তুলনামূলক সুবিধাকে ব্যবহার করেই কেবল এগোতে চেয়েছে।

উৎপাদনশীলতায় বাড়তি গতি আনতে প্রয়োজন শ্রমজীবী-কর্মজীবীদের প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধন। এ জন্য প্রয়োজন নিজস্ব প্রযুক্তি, কারিগর, প্রযুক্তিবিদ ও উদ্যোক্তা শ্রেণীর সরব উপস্থিতি। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান কাঙ্ক্ষিত মাত্রার অনেক নিচে। বিশেষ করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মূলশক্তি যে শ্রমিকরা–সেই দক্ষ শ্রমিক তৈরিতে বাংলাদেশ প্রতিযোগী থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, শ্রী লংকা, ভারত এবং পাকিস্তানের চেয়ে পেছনে। এক অনুসন্ধানী লেখায়[৬] দাবি করা হয়েছে, দক্ষ শ্রমিকের ঘাটতি দূর করতে বিদেশি শ্রমিক-কর্মকর্তার পেছনে প্রতি বছর ৬ বিলিয়ন ডলার বা প্রায় সাড়ে ৪৭ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়।

গ্রামীণ অর্থনীতি–গ্রামীণ শ্রম বাজার

বাংলাদেশের জনমিতির একটি বড় বৈশিষ্ট্য নগরে জনসংখ্যার ক্রম আধিক্য। তবে দেশে প্রায় সোয়া তিন কোটি পরিবারের ৮০ শতাংশের বাস এখনও গ্রামে। গ্রামই প্রায় ১২ কোটি মানুষের ঠিকানা। অন্যদিকে গ্রামীণ জনপদে কৃষি পেশায় নিয়োজিত মোট শ্রমশক্তির ৩৭ শতাংশই দিনমজুর হিসেবে কাজ করে। এ থেকে স্পষ্ট, গ্রামীণ মজুরির ওঠানামা বা মজুরিভিত্তিক কাজের স্থায়ীত্ব দেশের জনগণের একটা বড় অংশের জীবনযাত্রার মানকে প্রভাবিত করে। সাধারণভাবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গ্রামীণ অর্থনীতির লক্ষ্যণীয় শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। দেশের সব অঞ্চলেই মজুরি হারের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। তবে

[৫] ড. রুশিদান ইসলাম রহমান, দক্ষ শ্রমশক্তি ও মানবসম্পদ উন্নয়নের সম্ভাবনা, স মকাল, ১৮ মে ২০১৭, ঢাকা।

[৬] http://bangla.samakal.net/2016/10/26/245186

২০১৭-এর ৭ জানুয়ারি দৈনিক বণিকবার্তায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, চলতি ধারার উন্নয়ন কৌশলের কারণে গ্রামীণ মানুষদের সম্পদ না বেড়ে ঋণের বোঝা বেড়ে গেছে এবং দৃশ্যমান চাকচিক্যটিও মূলত ঋণনির্ভর। বর্তমানে গ্রামীণ পরিবারের মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ ৩ হাজার ১৭১ টাকা।[৭] ২০০০ সালে তা ছিল মাত্র ১ হাজার ৩৩৮ টাকা ২৭ পয়সা এবং ২০০৪ সালে ছিল মাথাপিছু ১ হাজার ৪২৯ টাকা ১৩ পয়সায়। ২০০৮ সালে এটি আরো বেড়ে হয় ২ হাজার ৩৮৮ টাকা ২৩ পয়সা। পরবর্তী পাঁচ বছরে তা বেড়ে ৩ হাজার টাকা ছাড়িয়ে যায়। অর্থাৎ গ্রামের মানুষদের দেড় দশকে মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ প্রায় আড়াই গুণ বেড়েছে। অন্যদিকে সম্পদ দেড় দশক আগে যেমন ছিল এখনো তেমনই আছে। ২০০০ সালে গ্রামীণ পরিবারের মাথাপিছু জমির পরিমাণ ছিল শূন্য দশমিক ১১ হেক্টর। এখনো তা-ই রয়েছে। গ্রামীণ পরিবারগুলোর গড় পারিবারিক আয় শহরের তুলনায় পাঁচ ভাগের তিন ভাগ।

শহর ও গ্রামের মধ্যে আয়বৈষম্যের একটি বড় কারণ শিক্ষা। গুণগতভাবে উন্নত শিক্ষায় এবং উচ্চশিক্ষায় গ্রামের শিক্ষার্থীরা এখনো অনেক পিছিয়ে। তবে কৃষির আধুনিকায়নের মধ্যদিয়ে গ্রামে কৃষি শ্রমিকদের মজুরি বেড়েছে। যদিও দীর্ঘমেয়াদে কাজের নিশ্চয়তা কমে যাচ্ছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে এমুহূর্তে যে পরিবর্তন চলছে তাতে দুটি বিষয় কাজ করেছে। একটি রেমিট্যান্স, অন্যটি কৃষির বহুমুখীকরণ। তবে রেমিট্যান্সের অর্থের উৎপাদনশীল ব্যবহার হচ্ছে না। বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগই প্রবাসী পরিবারগুলো খরচ করছে দৈনন্দিন কাজে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫ সালে দেশে আসা মোট রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ১৫ দশমিক ৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। কিন্তু বিনিয়োগ হয়েছে ওই অর্থের ২৫ শতাংশ মাত্র। আর আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) প্রতিবেদন বলছে, রেমিট্যান্সের ৮১ শতাংশ খরচ হয় পরিবারের ভরণ-পোষণসহ আনুষঙ্গিক কাজে। মাত্র ৭ শতাংশ অর্থ প্রবাসীর পরিবার ব্যাংকে জমা রাখে। এছাড়া জমি বা অন্যান্য সম্পদ কিনতে ব্যয় হয় ৫ শতাংশের একটু বেশি অর্থ।

অন্যদিকে ক্রমে অলাভজনক হয়ে উঠছে কৃষি। শস্যের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না কৃষক, যদিও বাড়ছে তাদের উৎপাদন খরচ। সরকারি সংস্থা কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তথ্যমতে, গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশে শস্যের গড় দাম কমেছে। ২০১০ সালে প্রতি টন শস্যের গড় দাম ছিল যেখানে ১৯ হাজার ১৯১ টাকা, ২০১৪ সালে তা নেমে আসে ১৭ হাজার ৫০০ টাকায়। সম্ভবত ২০১৭ সালে সবজি ও চালের মূল্যবৃদ্ধির কারণে এই পরিসংখ্যানের কিছু উন্নতি ঘটবে। তারপরও বলা যায় গ্রামীণ কৃষক শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির সুফল পাচ্ছেন না। ফলে বাড়ছে কৃষকের ঋণের বোঝা। কৃষিপণ্য শহরে যে দামে বিক্রয় হয়, তার থেকে অনেক কম দামে গ্রামের কৃষকদের থেকে ক্রয় করা হয়। লাভজনক না হওয়ায় ফসল আবাদে কৃষক নিরুৎসাহিত। যার সরাসরি অভিঘাত পড়ে গ্রামীণ মজুরদের ওপর।

পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যে এ দশকের মাঝামাঝি থেকে পতিত বা অনাবাদি জমি বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যায়। পতিত জমির পরিমাণ ২০১২-১৩ অর্থবছরে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৪ শতাংশের ওপর বৃদ্ধি পায়। এর পরের অর্থবছরে প্রায় ১৯ শতাংশ কমে গেলেও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে তা এক-তৃতীয়াংশের কাছাকাছি বা আড়াই লাখ একরের ওপর বৃদ্ধি পায়। একই সঙ্গে গত দশকের শেষের তুলনায় এ দশকের মাঝামাঝি দুই ফসলি আবাদি জমি কমে গেছে। তিন ফসলি আবাদি জমি ২০১৪-১৫ সালে এর আগের অর্থবছর থেকে দুই লাখ একরের মতো কমে গেছে। মোট আবাদি জমির পরিমাণ ২০১১-১২ অর্থবছরের পর আর বাড়েনি। এরও নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া পড়ছে গ্রামীণ খেতমজুর সমাজের ওপর।

অন্যদিকে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মৌসুমি মজুরির হার বেশ ওঠানামা করে। এক অঞ্চলে যখন কাজের সুযোগ থাকে না, তখন অন্য অঞ্চলে দেখা যায় অতিরিক্ত শ্রমিকের চাহিদা। তাই শ্রমিকের আঞ্চলিক গতিশীলতা লক্ষণীয়। যেমন: পূর্বাঞ্চলে সাধারণত জুলাই-অক্টোবর সময়ে কৃষি শ্রমিকের তেমন কাজ থাকে না। তখন তারা বিভিন্ন অকৃষি পেশায় নিয়োজিত হয়। অনেকে রাজধানী বা আশপাশের শহরে কাজের সন্ধানে যায়। অন্যদিকে পূর্বাঞ্চলে যখন আমন ও বোরো মৌসুম শুরু হয়, তখন কৃষি শ্রমিকের চাহিদা বাড়ে ও এই সময়ে উত্তরাঞ্চলের শ্রমিকেরা পূর্বাঞ্চলে পাড়ি জমায় কাজের সন্ধানে। দেশের উত্তরাঞ্চলের লোকজনের কর্মসংস্থানের মূল উৎস হচ্ছে কৃষি। সেখানে কৃষিতে কাজের সুযোগ রয়েছে মূলত কৃষি মৌসুমে। বছরের একটা বড় সময় কৃষিকাজ থাকে না এসব এলাকায়। এসময় তাদের বাধ্য হয়ে বেকার থাকতে হয় অথবা কাজের সন্ধানে রাজধানীসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের দিকে পাড়ি জমাতে হয়। এ ছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে গ্রামীণ শ্রম খাত কীভাবে বিপর্যস্থ সে বিষয়ে একটি অঞ্চলের সর্বশেষ পরিস্থিতির বিবরণ রয়েছে দশম অধ্যায়ে।

[৭] সুমন আফসার, গ্রামীণ পরিবার: সম্পদ না ঋণের বোঝা বাড়ছে, ৭ জানুয়ারি ২০১৭, বণিকবার্তা, ঢাকা।

বৈষম্যের স্বরূপ

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিয়ে যতটা আলোচনা হয় ততটাই কম হয় অর্থনৈতিক বৈষম্য ও অসাম্য নিয়ে। কিন্তু এই বিষয়টি বাংলাদেশের শ্রমজীবীদের অবস্থা বোঝার জন্য বিশেষ জরুরি। বাংলাদেশ অধ্যয়ন কেন্দ্র নামে একটি গবেষণা সংস্থার গবেষক আহমাদ ইব্রাহীম ২০১৭ সালের আগস্টে 'স্টেট অব বাংলাদেশ: আয় বৈষম্য' শীর্ষক এক গবেষণার ফল তুলে ধরে জানিয়েছেন, বাংলাদেশের উচ্চ আয়ের ১০ শতাংশের একটা গৃহস্থালী এবং নিম্ন আয়ের ৪০ শতাংশের একটা গৃহস্থালীর আয়ের মধ্যে পার্থক্য ১৩৮০ শতাংশ। ২০১৫ সালে উচ্চ আয়ের ১০ শতাংশের একটা গৃহস্থালী যখন মাসে গড়ে ১ লাখ ৪৭ হাজার ৩৮৮ টাকা আয় করে, তখন নিম্ন আয়ের ৪০ শতাংশের অন্তর্গত একটা গৃহস্থালীর গড় মাসিক আয় ১০ হাজার ৬৫৭ টাকা। গত ৪৬ বছর ধরে মোট জাতীয় আয়ে, নিম্ন আয়ের ৪০ শতাংশের আয় ৪.৯ শতাংশ কমেছে। বলাবাহুল্য নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোর মধ্যে শ্রমজীবীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

বাংলাদেশের সমাজে আয় বৈষম্য কীভাবে দারিদ্র্য ও অসমতা বাড়াচ্ছে সে বিষয়ে আরেকটা ভালো গবেষণা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক খান এ. মতিন। তাঁর গবেষণা কাজের শিরোনাম ছিল 'ইনকাম ইনিকুয়ালিটি ইন বাংলাদেশ।' ২০১৪ সালের ২৫ নভেম্বর তিনি বাংলাদেশ ইকোনোমিক এসোসিয়েশনের এক সম্মেলনে গবেষণাটি উপস্থাপন করেন।* তাঁর হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে আয়ের ক্ষেত্রে নীচের স্তরের থাকা শ্রমজীবী জনসংখ্যার ৮০ শতাংশের আয়ের হিস্যা ক্রমে কমে কমে তা উচ্চস্তরের ২০ শতাংশের আয়ে যুক্ত হচ্ছে। বছরে এই স্থানান্তর ঘটছে .৪৬ শতাংশ হারে। লক্ষ্যণীয় হলো, এখানে কেবল গরীবদের আয় হারিয়ে যাচ্ছে তাই নয়, মধ্যবিত্তদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটছে। অধ্যাপক খান এ. মতিনের গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে, সবচেয়ে নীচের ২০ শতাংশের বছরে আয়ের কমতি ঘটছে দশমিক ৭১ শতাংশ। এর উপরের ২০ শতাংশের আয়ের ঘাটতি ঘটছে দশমিক ৫৪ শতাংশ। তৃতীয় স্তরের ২০ শতাংশের আয়ের হিস্যা কমছে দশমিক ৩২ শতাংশ। চতুর্থ স্তরের ২০ শতাংশের আয়ের হিস্যা কমছে .২৭ শতাংশ। আর এই কমা আয় যুক্ত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি আয়ের ২০ শতাংশের পকেটে। বছরে তাদের দিকে এই আয় যাচ্ছে দশমিক ৪৬ শতাংশ করে।

উপরোক্ত চিত্রের আরেকটি দিক হলো উপরের স্তরের ১০ শতাংশ মানুষের সাথে নিচের স্তরের ১০ শতাংশ মানুষের আয় হিস্যার ব্যবধান বছরে ২.৫৬ শতাংশ হাড়ে বাড়ছে। একই গবেষণায় দেখা গেছে, ১৯৭৩ থেকে ২০১০ পর্যন্ত নীচের দিকের ৪০ শতাংশ মানুষের আয়ের হিস্যা কমেছে বছরে দশমিক ৬০ শতাংশ হারে। ১৯৭৩-এ জাতীয় পরিসরে এইরূপ মানুষদের আয়ের হিস্যা ছিল ১৮.৩০ শতাংশ। ২০১০ সালে তা এসে দাঁড়িয়েছে ১৪.৩২ শতাংশ। এদিকে শুধু যে দরিদ্র মানুষের আয় কমছে তাই নয়। তাদের ভোগের জাতীয় হিস্যাও কমছে। এক্ষেত্রে ১৯৮৮-৮৯ থেকে ২০১০ পর্যন্ত হিসাবে দেখা যায়–সবচেয়ে নিচের স্তরের ২০ শতাংশের ভোগ কমেছে ১.১৬ শতাংশ। এর উপরের স্তরের ২০ শতাংশের ভোগ কমেছে ১.৪৫ শতাংশ। পরবর্তী স্তরের ২০ শতাংশের ভোগ কমেছে ১.১৮ শতাংশ। চতুর্থ স্তরের ২০ শতাংশের ভোগ কমেছে .৩৮ শতাংশ। এইরূপ চিত্র পাল্টে যায় সবচেয়ে উপরের স্তরের ভোগের ক্ষেত্রে; সেটা বেড়েছে ৪.১৭ শতাংশ।

অন্যদিকে, ২০১৬-এর জুনে 'রাজনীতি, সুশাসন এবং মধ্যম আয়ের আকাঙ্ক্ষা: বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) জানিয়েছে, দেশের মানুষের মোট আয়ের ৪৬ দশমিক ২ শতাংশ বা প্রায় অর্ধেকই চলে যায় মাত্র ১০ শতাংশ ধনীর পকেটে। আর আয় ও জীবনযাত্রার মানের নিচের দিকে থাকা ৪০ শতাংশ গরিবের পকেটে যায় ১৩ শতাংশের মতো। সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে সমাজের ওপরের দিকে থাকা ১০ শতাংশ ধনীর বার্ষিক মাথাপিছু আয় ৪ হাজার ৯৬২ ডলার। টাকার অঙ্কে যা ৩ লাখ ৯৬ হাজার ৯৬০ টাকা। এই আয় ৪০ শতাংশ গরিবের মাথাপিছু বার্ষিক আয়ের প্রায় ১৪ গুণ। জীবনযাত্রার মানে পিছিয়ে থাকা বিশাল গরিব জনগোষ্ঠীর বার্ষিক মাথাপিছু আয় মাত্র ৩৫৯ ডলার।

* http://bea-bd.org/site/images/pdf/063.pdf

চালের দাম বাড়ায় ভাত কম খাচ্ছে নিম্ন আয়ের মানুষ*

- প্রথম আলো, ৮ জুন ২০১৭

মহানন্দ বিশ্বাস এখন দুপুরে আধপেটা খেয়ে কাটান, রাতে খান পেটভরে। দুপুরে হোটেলে এক থালা ভাত খেতে দাম দিতে হয় ১২ টাকা। আগের চেয়ে প্রতি থালা ভাতের দাম ২ টাকা বেড়েছে, ভাতের পরিমাণও কমেছে। ফলে এখন ভরপেট খেতে গেলে এক বেলায় ভাতের পেছনেই ব্যয় হয় কমপক্ষে ৩৬ টাকা।

মহানন্দ বললেন, রাজধানীর মিরপুর ১ নম্বর সেকশন এলাকায় জুতা সেলাইয়ের কাজ করে দিনে ৪০০ টাকার বেশি আয় হয় না। ফলে দুপুরে ৬০-৭০ টাকা খরচ করে পেটভরে খাওয়ার কোনো সুযোগই নেই। চালের দাম বেড়ে যাওয়ায় এখন যশোরের শেখহাটিতে থাকা স্ত্রী-সন্তানের জন্য বাড়তি খরচ পাঠাতে হয়। কিন্তু আয় বাড়েনি।

চালের দামে গত কয়েক বছর মহানন্দ বিশ্বাসের মতো মানুষেরা যে স্বস্তিতে ছিলেন, তা চরম অস্বস্তিতে পরিণত হয়েছে ২০১৭ সালে। বিশ্বের মধ্যে মোটা চালের দাম এখন বাংলাদেশেই সবচেয়ে বেশি। বেড়েছে সব ধরনের মাঝারি ও সরু চালের দামও। ফলে স্বস্তিতে নেই সীমিত আয়ের মানুষেরা। চার-পাঁচ সদস্যের একটি পরিবারে কেবল চাল কেনার পেছনেই খরচ বেড়েছে ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত। প্রধান খাদ্যের দাম বাড়ায় রিকশাভাড়া বেড়েছে, কর্মজীবী মানুষকে বাইরে খেতে বাড়তি খরচ গুনতে হচ্ছে। এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদ হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, চাল এখনো খাদ্যতালিকার প্রধান আইটেম। এর দাম বাড়লে নিম্ন আয়ের মানুষেরা দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ ঠিক রাখতে গিয়ে অন্যান্য খরচ কমিয়ে ফেলে। অথবা অনেক সময় দেনাও করতে হয়। ফলে চালের দাম বাড়লে অবধারিতভাবে একটা প্রভাব পড়ে, সেটা কষ্টের। রাজধানীর খুচরা বাজারে ২০১৭ সালে মোটা চাল মানভেদে ছিল ৪৫ থেকে ৪৮ টাকা, মাঝারি মানের চাল ৫০-৫৪ টাকা ও সরু চাল ৫৬-৫৮ টাকা। ঢাকায় সবচেয়ে জনপ্রিয় রশিদ, এরফান, মোজাম্মেলসহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মিনিকেট চাল। সেগুলো দীর্ঘদিন ৪৪ থেকে ৪৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। কয়েক মাসে সেটা বাড়তে বাড়তে ৫৬ টাকায় উঠেছিল।

ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) হিসাবে, ২০১৬ সালে যে মোটা চাল পাওয়া যেত ৩০ টাকা কেজিতে, এখন সেটা বিক্রি হচ্ছে ৪৫ টাকায়। ফলে গত বছরের তুলনায় ২০১৭ সালে চালের দাম প্রায় ৪২ শতাংশ বেড়ে যায়। রাজধানীর কারওয়ান বাজার ও মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নতুন মৌসুমের চালের সরবরাহ বাড়লেও সেখানে দাম কমেনি। কৃষি মার্কেটের আলিফ রাইস এজেন্সির মালিক আবদুস সালাম বলেন, তাঁর দোকানে হাইব্রিড মোটা চাল ৪২ টাকা, মোটা পাইজাম ৪৭ টাকা ও বিআর আটাশ ৪৯ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। তিনি বলেন, সবাই আশা করেছিল নতুন চাল আসার পর দাম কমবে, কিন্তু বেড়েছে। যেমন পুরোনো মিনিকেট ৪৮ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছিল, এখন নতুন মিনিকেট ৫৩ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশের (ক্যাব) হিসাবে, ২০১৫ সালে মোটা চালের গড় দাম ছিল মানভেদে ৩৩ থেকে ৩৫ টাকা। ২০১৬ সালে তা ৩৫ থেকে ৩৭ টাকায় ওঠে। সর্বশেষ ২০১৭ সালের মে মাসে গড় দাম ৪৩-৪৫ টাকায় উঠেছে। আর পরে তা আরও বাড়ছেই। শাহবাগে নিম্ন আয়ের মানুষের কাছে ভাত বিক্রি করেন নূর জাহান। জানালেন, রিকশাওয়ালারাই তাঁর প্রধান ক্রেতা। ভাতের জন্য এখন প্রতিজনকে প্রতি বেলায় অতিরিক্ত ছয় টাকা দিতে হয়। ভাতের দাম বেশি হওয়ায় ক্রেতারা এখন ডিমের তরকারির পরিবর্তে শুধু ডিম ভাজি দিয়ে খান।

দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে রিকশাচালকেরা ঢাকায় এসে গ্যারেজে অবস্থান করেন। সেখানে তিন বেলা খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করেন গ্যারেজ পরিচালক। নেত্রকোনা থেকে ঢাকায় আসা রিকশাচালক নুরুজ্জামান জানান, আগে একজনের এক দিনের খাওয়ার খরচ ছিল ১০০ টাকা। চালের দাম বাড়ায় এখন সেটা বেড়ে গেছে।

২০১০ সালের খানা আয়-ব্যয় জরিপ অনুযায়ী, দেশের মানুষ মাথাপিছু প্রতিদিন ৪১৬ গ্রাম চাল খায়। গ্রামে দৈনিক মাথাপিছু চাল খাওয়ার হার ৪৪১ দশমিক ৬ গ্রাম। অন্যদিকে শহরে এ হার ৩৪৪ দশমিক ২ গ্রাম। মানুষের মাথাপিছু দৈনিক ক্যালরি গ্রহণের ৬২ শতাংশ আসে চাল থেকে।

[*এই প্রতিবেদন প্রকাশের পর ২০১৭ সালে চালের দাম কেজি প্রতি আরও বেড়েছে ৪-৫ টাকা]

৪

খাতভিত্তিক পর্যালোচনা

গার্মেন্টস শ্রমিক, প্রবাসী শ্রমিক, চা শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, পাথর এবং ইটভাঙ্গা শ্রমিক

মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে গার্মেন্টস শ্রমিকরা

শ্রম মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের (ডিআইএফই) তথ্যভান্ডার অনুযায়ী, সারা দেশে ৪ হাজার ৭৬৫টি (ইপিজেডের কারখানা অন্তর্ভুক্ত নয়) পোশাক কারখানা আছে। এর মধ্যে ঢাকায় ১ হাজার ৯৬১টি, গাজীপুরে ১ হাজার ২৯৭টি, নারায়ণগঞ্জে ৭৩৪টি ও চট্টগ্রামে ৬৭৪টি কারখানা আছে। এসব কারখানার অধিকাংশই বাংলাদেশ পোশাক খাতের শিল্প-কারখানার মালিকদের প্রধান দুই সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর সদস্য। তবে বর্তমানে কিছু কারখানা উৎপাদনে নেই। উপরোক্ত শিল্পাঞ্চলগুলোর মধ্যে বিগত বছরে বিশেষভাবে ঢাকা, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জে বকেয়া মজুরি এবং সাধারণভাবে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে সভা-সমাবেশ হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। বাংলাদেশের শিল্পখাতে ২০১৭ সাল শুরুই হয় মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আশুলিয়া ও সাভারে গার্মেন্টস শ্রমিকদের আন্দোলন পরবর্তী দমন-পীড়নের মধ্যদিয়ে। ২০১৬ সালের শেষ সপ্তাহগুলোতে শুরু হওয়া এই আন্দোলনের রেশ ২০১৭ সালের শুরুতেও অব্যাহত ছিল। যদিও তখন চলছিল মূলত গ্রেফতার ও নিপীড়নপর্ব। শ্রমিকরা সর্বনিম্ন বেতন ১৬ হাজার টাকা করার দাবিতে কর্মবিরতিসহ বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিল। এসময় শ্রমিক বিক্ষোভের মুখে মালিকরা ঢাকা থেকে ৩০-৩৫ কিলোমিটার দূরবর্তী সাভারের আশুলিয়ায় ৫৫টি কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে। তবে সরকারের সঙ্গে আলোচনা ও প্রশাসনের কাছ থেকে 'নিরাপত্তা'র আশ্বাস পাওয়ায় ছয় দিন পর এসব কারখানা খুলে দেয়া হয়। কিন্তু এর পরও বরখাস্ত করা হয় ১৬ শ' শ্রমিককে। আর মামলা করা হয় প্রায় দেড় হাজার শ্রমিকের বিরুদ্ধে। বরখাস্ত ও মামলার পাশাপাশি এই ঘটনায় শ্রমিক সংগঠকদের আটক অব্যাহত ছিল। আটক শ্রমিক নেতারা হলেন- তৃণমূল গার্মেন্ট শ্রমিক ফেডারেশনের আশুলিয়া শাখার সভাপতি শামিম আহম্মেদ, গার্মেন্ট শ্রমিক ফ্রন্ট সভাপতি সৌমিত্র কুমার দাস, স্বাধীন বাংলা গার্মেন্টস কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি আল-কামরান, সাধারণ সম্পাদক শাকিল আহমেদ, টেক্সটাইল গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের আহ্বায়ক মিজানুর রহমান মিজান, বাংলাদেশ গার্মেন্টস এ্যান্ড শিল্প শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রফিকুল ইসলাম সুজন, বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম প্রমুখ। জানুয়ারির ১২ তারিখ পর্যন্ত ১১ জন শ্রমিক নেতা পুলিশের হেফাজতে ছিলেন। এসব শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে একাধিক মামলাসহ ৯টি করে মামলা দায়ের করা হয় এবং ১৫-২০ দিন করে রিমান্ডে নেয়া হয়।

উল্লেখ্য, দ্রব্যমূল্য ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতেই মূলত আশুলিয়ায়-সাভার-গাজিপুরের গার্মেন্টস শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছিল। আশুলিয়ায় প্রায় ১৫ শত পোশাক তৈরির কারখানা রয়েছে। যার মধ্যে জামগড়ের একটি কারখানা থেকে এই আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। এই আন্দোলন প্রাথমিকভাবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে শুরু হলেও কোন কারখানাতেই শ্রমিকদের দাবি বিবেচনায় নিয়ে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি এবং অসন্তোষ নিরসনের চেষ্টা না করেই শ্রমিক নেতাদের গ্রেফতার ও তাদের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা দায়ের করা হয়।

এইরূপ দমন-পীড়ন চলাকালেই ২০১৭ সালের ৪ জানুয়ারি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক জানিয়েছিলেন আশুলিয়ার শ্রমিক পরিস্থিতিতে শ্রম অধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে কি-না, তা খতিয়ে দেখা হবে। কমিশনের কারওয়ান বাজার কার্যালয়ে গার্মেন্টস শ্রমিক অধিকার আন্দোলনের ১২ সদস্যের একটি দল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি তখন এটা বলেছিলেন। আশুলিয়ার শ্রমিক ইস্যুতে তাঁর হাতে সেসময় একটি স্মারকলিপিও দেওয়া হয়। স্মারকলিপি গ্রহণ করে মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন,

আশুলিয়ার আন্দোলনরত শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সালের বিশেষ আইনে মামলা দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শ্রমিক নির্যাতনেরও অভিযোগ করছেন শ্রমিক নেতারা। এসব বিষয় খতিয়ে দেখবো। কীভাবে শ্রমিকদের সমস্যার সমাধান করা যায়, তা নিয়ে কাজ করবো। তাজরীনের অগ্নিকান্ডে দেখেছি, শ্রমিকদের জীবনের চেয়ে কাপড়ের নিরাপত্তাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলেন মালিকপক্ষ।

এদিকে শ্রমিকরা যখন নতুন মজুরি কাঠামোর জন্য এই আন্দোলন করছিল তখনও অনেক কারখানায় ২০১৩ সালের মুজরি ঘোষণারও বাস্তবায়ন হয়নি বলে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে সরকারি এক প্রতিবেদনেই। ২০১৭ সালের ১ মার্চ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত এক খবরে জানা যায় দেশে এখনো ১০ শতাংশ গার্মেন্টস কারখানা ২০১৩ সালের মজুরি ঘোষণাই অনুসরণ করে না। কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই)-এর ২০১৬-এর জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের কমপ্লায়েন্স রিপোর্টে এমন তথ্য পাওয়া গেছে। আলোচ্য সময়ে ৮৮৮টি কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫৯৩টি বিজিএমইএর সদস্য ও ১২০টি বিকেএমইএ'র সদস্যভুক্ত কারখানা। আর, এ দুটি সংগঠনের সদস্য নয়, এমন কারখানা রয়েছে ১৭৫টি।

এই প্রতিবেদন অনুযায়ী, পরিদর্শন হওয়া বিজিএমইএ'র সদস্যভুক্ত ৫৯৩টি কারখানার মধ্যে ৯২ শতাংশ কারখানা সরকার নির্ধারিত মজুরি কাঠামো অনুসরণ করে। বাকী ৮ শতাংশ কারখানা সরকার নির্ধারিত মজুরি কাঠামো অনুসরণ করে না। বিকেএমইএ সদস্যভুক্তদের মধ্যে এটি অনুসরণ করে না ১০ শতাংশ কারখানা। অন্যদিকে এ দুটি সংগঠনের সদস্য নয়, এমন কারখানাসমূহ এক্ষেত্রে আরও পিছিয়ে। এসব কারখানার ১৭ শতাংশই সরকার নির্ধারিত মজুরি কাঠামো অনুসরণ করে না।

মজুরি বৃদ্ধির দাবির পাশাপাশি ২০১৭ সাল জুড়ে পোশাক শিল্পে প্রধান এক বিষয় ছিল কারখানার নিরাপত্তা প্রশ্ন। এসময় খবর প্রকাশিত হয় যে, যথাসময়ে সংস্কার কাজ শেষ করতে না পারা এবং অসহযোগিতা করার অভিযোগে এ পর্যন্ত দেশের ২৩৯টি গার্মেন্টসের সঙ্গে ব্যবসায় বাতিলের ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশে ইউরোপ ও আমেরিকার পোশাক ক্রেতাদের কারখানা পরিদর্শনকারী জোট 'অ্যাকর্ড' ও 'অ্যালায়েন্স'। এ দুটি জোট বাংলাদেশের গার্মেন্টস কারখানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন শেষে সংস্কার কার্যক্রম দেখভাল করছিল ২০১৭

শ্রমিকনেতাদের মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন

সাল জুড়ে। এদিকে ব্যবসা বাতিলের ঘোষণা দেওয়ায় বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যবসা করছে ইউরোপ ও আমেরিকার এমন প্রায় আড়াইশ' ব্র্যান্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে কোন ধরনের ব্যবসা করতে পারবে না উল্লিখিত কারখানাগুলো। অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স তাদের ওয়েবসাইটে এসব কারখানার নাম ও ব্যবসা বাতিলের কারণ জানিয়েছে।

২০১৩ সালের এপ্রিলে রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর ইউরোপ ও আমেরিকার ক্রেতারা আলাদা দুটি পরিদর্শন প্লাটফর্ম গড়ে তোলে এবং এ দেশের কারখানাগুলোর অবকাঠামো পরীক্ষার উদ্যোগ নেয়। ২২৮টি ব্র্যান্ডের সমন্বয়ে গঠিত জোট 'অ্যাকর্ড' প্রায় দেড় হাজার কারখানার প্রাথমিক পরীক্ষা শেষে সংস্কার কাজ তদারক করছে। আর 'অ্যালায়েন্স'-এর সদ্যভুক্ত ব্র্যান্ড ৩০টি। এ জোট প্রায় সাতশ' কারখানার সংস্কার তদারক করছে।

অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের এরূপ কার্যক্রমের মাঝেই ২০১৭ সালে গাজিপুরে একটি কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে অনেক শ্রমিকের হতাহতের ঘটনা ঘটে। গাজীপুরের কাশিমপুরে পোশাক কারখানা 'মাল্টিফ্যাবস'-এর ঐ বিস্ফোরণে ১৩ জনের প্রাণহানি ও বহু হতাহতের পর পোশাক কারখানাগুলোর বয়লার নিরাপত্তার বিষয়টিও নিজেদের পর্যবেক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা করছে বলে জানিয়েছে ইউরোপিয় ক্রেতাদের জোট অ্যাকর্ড।

এই পরিদর্শক জোট পোশাক শিল্পের কর্ম-পরিবেশ উন্নয়নে দ্বিতীয় মেয়াদে আরও তিন বছর থাকতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে বলে প্রচারমাধ্যমে খবর এলেও এতে সরকার ও মালিকদের তরফ থেকে আপত্তি রয়েছে। ব্র্যান্ড ও ক্রেতা-প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে অ্যাকর্ড নতুন চুক্তি করায় অস্বস্তি

বোধ করছে সরকার ও পোশাক শিল্পের মালিকপক্ষ। বর্তমান চুক্তিতে ২০১৮ সালের মে মাসে অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের তদারকি শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।

গার্মেন্টস পরিদর্শন জোট অ্যাকর্ড বাংলাদেশে পোশাক খাতের শ্রমিকদের জন্য নতুন মজুরি বোর্ড গঠনের পক্ষেও মত দিয়েছে। মজুরি বোর্ড গঠনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি চিঠিও পাঠিয়েছে তারা। সেই সঙ্গে আশুলিয়ার শ্রম অসন্তোষ ও এর জেরে শ্রমিকদের চাকরিচ্যুতির ঘটনায় অ্যাকর্ডের পক্ষ থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং ঐ ঘটনার পরপরই অ্যাকর্ড শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবির সমর্থনে বক্তব্য প্রদান করে। তবে দেশে বিদেশে গার্মেন্ট খাতের বিভিন্ন অনিয়ম নিয়ে আলোচনার পরও ২০১৭-এর উৎসবকালে (ঈদুল আযহা) প্রথম আলোতে সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, ৪০ শতাংশ কারখানায় শ্রমিকরা নির্ধারিত সময়েও উৎসব ভাতা পাননি। এমনকি যাঁরা উৎসব ভাতা পেয়েছেন–তাদেরও ভাতার পরিমাণ ছিল আইনে নির্ধারিত অংকের চেয়ে কম। বেশিরভাগ কারখানায় মূল বেতনের ৪০-৬০ শতাংশ পরিমাণ অর্থ ভাতা হিসেবে দেয়া হয়। (২০ জুন ২০১৭)

জিএসপি প্রসঙ্গ

২০১৭-এও বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য সুবিধা (জিএসপি) ফিরে পায়নি। চার বছর পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধায় স্থগিতাদেশ জারি করেছিল তৎকালীন ওবামা প্রশাসন। রানা প্লাজা ধসের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রম অধিকার ইস্যুকে গুরুত্ব দিয়েই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল দেশটি। এরপর প্রতিবছর যুক্তরাষ্ট্র জিএসপি সুবিধার বার্ষিক পর্যালোচনা করলেও বাংলাদেশকে এই সুবিধা ফিরিয়ে দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়নি।

২০১৭ সালে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি সংস্থা ইউএসটিআর এক ঘোষণায় জিএসপির সুবিধা পাওয়া নতুন পণ্য ও দেশের যে বিবরণ প্রকাশ করে তাতে বাংলাদেশের নাম ছিল না। বর্তমানে এ সুবিধা পাওয়া দেশগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো ভারত, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ব্রাজিল, একুয়েডর, তুরস্ক, পাপুয়া নিউগিনি, পাকিস্তান, মিসর ও কাজাখস্থান। নতুন জিএসপি কার্যক্রমের আওতায় ২০১৭-এর ১ জুলাই থেকে এ সুবিধা পাচ্ছে ঐ দেশগুলো।

উল্লেখ্য, জিএসপি হল জেনারেলাইজড সিস্টেম অব প্রেফারেন্স। রপ্তানির ক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বে শুল্কমুক্ত অগ্রাধিকারমূলক সুবিধা পাওয়াকেই জিএসপি বলে। অর্থাৎ শুল্কমুক্ত অগ্রাধিকারমূলক সুবিধা থাকলে, যে দেশে পণ্য যাবে, সে দেশে কোন প্রকার ভ্যাট, ট্যাক্স দিতে হয় না। এই জন্য ক্রেতাদের টাকা কম খরচ হয়। এইরূপ সুবিধা পেলে বাংলাদেশি মালিকদের বেশি লাভ হয়। সাধারণত বিদেশি ক্রেতা ঐ সব দেশ হতে পোশাক কিনে, যে দেশে জিএসপি সুবিধা আছে।

তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, রফতানি বাণিজ্যে বড় কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারেনি জিএসপি স্থগিতাদেশ। ২০১৬ সালের রফতানি পরিসংখ্যানে এ দাবির সমর্থন পাওয়া যায়। ২০১৬ সালের যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য রফতানি থেকে বাংলাদেশের আয় প্রবৃদ্ধির হার ছিল দুই অংকের ঘরে। এ প্রসঙ্গে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (রফতানি) মো. আব্দুর রউফ দৈনিক বণিক বার্তাকে বলেছেন, 'মার্কিন জিএসপি নিয়ে সরকারের অবস্থান হলো, আমরা এ সুবিধা চাইব না। তারা যদি একতরফা সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এ সুবিধা দেয়, তাহলে তা গ্রহণ করা হবে।'[৮]

এদিকে ২০১৭ সালের শুরুতেও বাংলাদেশের শ্রম অধিকার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন মার্কিন কংগ্রেসের কয়েকজন সদস্য। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেয়া এক চিঠিতে মার্কিন কংগ্রেসের ১১ সদস্য বলেন, 'আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি, শ্রম অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দিক থেকে বাংলাদেশ ভুল পথে ধাবমান। এ প্রেক্ষাপটে আমরা আপনার ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ কামনা করছি। পাশাপাশি শ্রম অধিকার বিষয়ে সরকারের নীতি ও চর্চার অবক্ষয়ের কারণ পরিষ্কার করারও অনুরোধ জানাচ্ছি।'[৯]

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, 'পোশাক শিল্পে শ্রম অধিকার নিয়ে শান্তিপূর্ণ কর্মকান্ডে নিয়োজিত নেতাদের গ্রেফতার ও আটকের ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশে। দুই দেশের জোরদার সম্পর্কের সমর্থক হিসেবে এ বিষয়ে আমরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি। আমরা জানতে পেরেছি, পোশাক শিল্পে 'বড় ধরনের রূপান্তর', 'কর্মপরিবেশ নিরাপত্তা' ও 'শ্রমিক কল্যাণ'-এর ঘোষণা নিয়ে ঢাকা অ্যাপারেল সামিট-২০১৭ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। যদিও পরিস্থিতি বিজিএমইএর এসব ঘোষণার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।'

[৮] বদরুল আলম, যুক্তরাষ্ট্রের জিএসপি সুবিধা, ১০ জুলাই ২০১৭।

[৯] পূর্বোক্ত।

প্রবাসী শ্রমিকদের মৃত্যুতে স্বজনদের কান্না

অনিশ্চয়তায় প্রবাসী শ্রমিকরা

গার্মেন্টস পণ্য রফতানি আর প্রবাসীদের রেমিটেন্সে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রেকর্ড গড়ছে। এই রিজার্ভ নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিমাসে সাফল্যের 'বার্তা' প্রচার করে থাকে। কিন্তু ২০১৭ সালে বছরজুড়ে উপরোক্ত বার্তার পাশাপাশি মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশী শ্রমিকদের গ্রেফতারের খবরও প্রতিদিন মিডিয়ায় প্রচার হয়েছে। গ্রেফতারকৃত ঐ শ্রমিকরা কারাগারে দূর্বিষহ জীবন যাপন করছে। আবার যারা এখনো গ্রেফতার হননি তারাও আতঙ্কে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। গত বছর মালয়েশিয়ায় অবৈধ বিদেশি শ্রমিক ধরতে মাঝে মাঝেই ব্যাপক অভিযান চালানো হয়। ৩০ জুন থেকে চলা অভিযানে প্রায় এক হাজার বাংলাদেশি শ্রমিক আটক হন। এর আগে ২০১৭ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩০ জুন অবৈধভাবে অবস্থানরত বিদেশি শ্রমিকদের বৈধকরণের সুযোগ দেয়া হয়। বাংলাদেশী অনেক শ্রমিক এ সুযোগ গ্রহণে ব্যর্থ হয়। ভুক্তোভোগী শ্রমিকদের অভিযোগ বৈধকরণের কাগজপত্র ঠিক করতে যারা টাকা নিয়েছিল তারা কাজটি করেনি। এতে শ্রমিকরা অনিশ্চয়তায় পড়েছেন। কাগজ বৈধ করতে সেখানে বাংলাদেশ দূতাবাসের কিছু অসাধু কর্মকর্তার যোগসাজসে দালালচক্র সৃষ্টি হয়েছে। ঢাকা থেকে প্রচারিত কয়েকটি টিভির সচিত্র খবরে দেখা গিয়েছে শ্রমিকরা ভিসার মেয়াদ বাড়াতে দালালের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা দিয়েও কোনো ফল পাননি। তাদের অভিযোগ দূতাবাসের কোনো সহযোগিতা পাওয়া যায়নি এক্ষেত্রে। অবশ্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী নুরুল ইসলাম বিএসসি তাঁর দপ্তরে দৈনিক ইনকিলাবের সাথে আলাপকালে (দেখুন, ১০ জুলাই ২০১৭) বলেছেন, মালয়েশিয়ায় অবৈধ অভিবাসীদের ধরপাকড়ে বাংলাদেশীদের আতংকিত হবার কিছু নেই। গত ৩০ জুন অবৈধ অভিবাসী কর্মীদের এক বছর মেয়াদী অস্থায়ী পাস ই-কার্ড ইস্যুর কার্যক্রম বন্ধ হলেও মালয়েশিয়া সরকার অবৈধ কর্মীদের বৈধতা লাভের জন্য রিহায়ারিং কর্মসূচির মেয়াদ আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়েছে। রিহায়ারিং কর্মসূচিতে ২ লাখ ৫৮ হাজার অবৈধ কর্মী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এদের মধ্যে বেশির ভাগই বাংলাদেশী।[১০]

এদিকে বাংলাদেশের প্রবাসীদের প্রধান গন্তব্যস্থল সউদী আরবেও গত বছর জনশক্তি রফতানি সমস্যাপূর্ণ ছিল। নারীশ্রমিকসহ নতুন করে শ্রমিকপাঠানো শুরু হলেও সউদী আরবে বাংলাদেশী শ্রমিকদের চাকরি হারানো সংক্রান্ত নতুন ধাক্কা আসে গত বছরের ২১ এপ্রিল। ওই দিন 'শপিংমলগুলোতে প্রবাসীরা চাকরি করতে পারবেন না'– সউদী প্রশাসন এই মর্মে নির্দেশ জারি করে। দেশটির নাগরিকদের দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থান প্রকল্পের অংশ হিসেবে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে সেখানে শপিংমলে কর্মরত লক্ষাধিক বাংলাদেশি শ্রমিক বেকার হবে। শপিংমলে কর্মরত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কর্মীর চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে তারা চুক্তি নবায়ন করবে না জানিয়ে দিয়েছে। উল্লেখ্য, সউদী শপিংমলের খুচরা দোকানগুলোতে বর্তমানে ১৫ লাখ শ্রমিক কর্মরত। এদের মধ্যে স্থানীয় নাগরিক মাত্র ৩ লাখ। অন্যদিকে, মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশী শ্রমিকদের তৃতীয় বৃহত্তম শ্রমবাজার কাতারেও নতুন শ্রমআইন তাদের বিপদে ফেলেছে। ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে করা নতুন আইনে বলা হয়েছে, অনুমতি ব্যতীত কোনো শ্রমিককে নিয়োগদাতা অন্য কোম্পানীতে কাজে লাগাতে পারবেন না। এই আইন অমান্য করলে শাস্তি ৫০ হাজার কাতার রিয়াল জরিমানা এবং ৩ বছর কারাদন্ড। ফলে শ্রমিকরা সুবিধা মতো মালিক পরিবর্তন করতে পারছে না এখন। এ ছাড়াও আঞ্চলিক রাজনীতির মেরুকরণে কাতারের সঙ্গে সউদী জোটের ৬ দেশের সম্পর্ক ছিন্নের কারণে অনেক বাংলাদেশির মধ্যেই আতঙ্ক বিরাজ করছে। তাদের শঙ্কা, অবরোধের কারণে কাতারে অর্থনৈতিক সংকট শুরু হলে তারা চাকুরিচ্যুত হতে পারেন। কাতারে বর্তমানে প্রায় ৩ লাখ বাংলাদেশী রয়েছে।

২০১৭ সালে কুয়েতে বাংলাদেশি শ্রমিক নিয়োগের প্রক্রিয়া আবার শুরু হয়। সর্বশেষ দুই বছরে অর্ধলক্ষ বাংলাদেশি শ্রমিক নতুন ভিসায় কুয়েতে এসেছেন। প্রথম অবস্থায় তিন থেকে সাড়ে তিন লাখ টাকা খরচ দিয়ে কুয়েত এলেও বর্তমানে খরচ সাত লাখের ওপরে।

[১০] স্টালিন সরকার, প্রবাসী শ্রমিকদের কান্না, ১৩ জুলাই ২০১৭।

কুয়েতে শ্রমিক প্রেরণে বর্তমানে কোনো নীতিমালা না থাকায় বা থাকলেও যথাযথ প্রয়োগ না থাকায় হাতবদলের পালায় পড়ে ভিসার মূল্য আকাশচুম্বী হয়ে যাচ্ছে। কিছু প্রবাসী বাংলাদেশীই এইরূপ মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করছেন।

প্রবাসী কর্মজীবীদের লাশ হয়ে দেশে আসা বাড়ছে

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আনুমানিক এক হিসাবে[১৯] এ মুহূর্তে বিশ্বের প্রায় ১৬০টি দেশে প্রায় এক কোটি বাংলাদেশী শ্রমজীবী-কর্মজীবী রয়েছেন। এদের অনেকেই সাময়িক সময়ের জন্য কাজে গিয়েছেন এবং অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও এরূপ প্রবাসী শ্রমিকদের বিদেশে উচ্চহারে মৃত্যু অব্যাহত ছিল। গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, প্রতিদিন গড়ে আট থেকে দশজন প্রবাসী লাশ হয়ে দেশে ফিরছেন। যাদের বেশীরভাগের বয়স ২৫ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। এসব মৃত্যুর অধিকাংশই অস্বাভাবিক। ৯০ শতাংশেরও বেশি মারা যাচ্ছেন হৃদরোগ, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ কিংবা দুর্ঘটনায়। সাধারণ রোগে বা বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু খুবই কম। সরকারি হিসাবে, ২০০৫ সালে বিদেশে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মৃত্যুর সংখ্যা ছিল এক হাজার ২৪৮ জন। ১০ বছরে এ সংখ্যা বেড়েছে কয়েকগুন। ২০১৫ সালে প্রবাসে তিন হাজার ৩০৭ জন বাংলাদেশি মারা গেছেন। ২০১৬ সালে মোট ৩ হাজার ৪৮১ জনের লাশ এসেছে। ২০১৬ পর্যন্ত পূর্ববর্তী দশ বছরে মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং অন্যান্য দেশে মোট ২৮ হাজার ১৯ জন বাংলাদেশী মারা গেছেন। যাদের মধ্যে শ্রমিকের সংখ্যাই ২৫ হাজার।

অন্যদিকে, ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত ১ হাজার ৭শ' ৫৭ জন প্রবাসী বাংলাদেশির মরদেহ দেশে ফেরত আনা হয়েছে। এরমধ্যে হযরত শাহ জালাল বিমান বন্দর দিয়ে ১ হাজার ৫৫৩ জনের, চট্টগ্রামের শাহ আমানত বিমানবন্দর দিয়ে ১৭৬ জন এবং সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে ২৮ জনের মরদেহ এসেছে।

প্রবাসী বাংলাদেশি, মৃতদের স্বজন ও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিভিন্ন কারণে প্রবাসী বাংলাদেশিরা মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ ও হৃদরোগে আক্রান্ত হচ্ছে। যে বিপুল টাকা খরচ করে বিদেশে যান তাঁরা, সেই টাকা তুলতে অমানুষিক পরিশ্রম, দিনে ১২ থেকে ১৮ ঘণ্টা কাজ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গাদাগাদি করে থাকা, দীর্ঘদিন স্বজনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা ইত্যাদি কারণে মানসিক চাপে ভোগেন তাঁরা। কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ জুলহাস প্রচারমাধ্যমকে জানিয়েছেন, 'এমন মৃত্যু মেনে নেওয়া আসলেই কষ্টকর। যেহেতু প্রায় এক কোটি বাংলাদেশি বিদেশে থাকেন, কাজেই দিনে ৮-১০ জনের লাশ আসাকে আমরা অস্বাভাবিক দেখি না। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ দেখা যায় দুর্ঘটনা, স্ট্রোক বা হৃদরোগ।'

উল্লেখ্য, প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড প্রবাসীদের লাশ দেশে আনতে সহযোগিতা করে থাকে। মৃত ব্যক্তিদের পরিবারগুলোকে দাফনের জন্য বিমানবন্দরে বোর্ড ৩৫ হাজার টাকা করে এবং পরে ৩ লাখ টাকা করে আর্থিক অনুদান দেয় বলে দাবি করা হয়। এদিকে ২৯ অক্টোবর ২০১৭ তে দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, সর্বশেষ সাত বছরে যেসব শ্রমিক বিদেশে কর্মরত অবস্থায় মারা গিয়েছেন তাদের ৭৫ ভাগ পরিবারই কোন ক্ষতিপূরণ পায়নি। এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য থেকে দেখা যায়, ২০০৯ থেকে ২০১৭-এর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত বিদেশ থেকে প্রায় ১৮ হাজার শ্রমিকের মৃতদেহ এসেছে। কিন্তু এই শ্রমিকদের পরিবারগুলোর মধ্যে মাত্র সাড়ে ৪ হাজারটি বিদেশী নিয়োগকারীদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। সাধারণভাবে বাংলাদেশী শ্রমিকরা যে ধরনের চুক্তির মাধ্যমে বিদেশে কাজ করতে যায় তার দুর্বলতার কারণে হৃদরোগ বা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নয়। কেবল কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা বা সড়ক দুর্ঘটনা হলেই ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হয় শ্রমিকরা। সেক্ষেত্রেও রয়েছে হয়রানি ও দীর্ঘসূত্রিতা। প্রথম আলোর উপরে উল্লিখিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, "বাংলাদেশ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রবাসে কোনো শ্রমিক মারা গেলে সে দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডকে জানানো হয়। বোর্ড আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কথা বলে মৃতদেহ দেশে আনা বা বিদেশেই দাফনের ব্যবস্থা করে। অথবা প্রবাসী শ্রমিকের আত্মীয়স্বজন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডকে জানালে বোর্ড দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে মৃতদেহ দেশে আনা বা বিদেশে দাফনের সিদ্ধান্ত নেয়। ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য বোর্ডের মাধ্যমে কাগজপত্র দূতাবাসে পাঠানো হয়। দূতাবাস আদালতে ক্ষতিপূরণের মামলা করে। মামলা নিষ্পত্তি হলে মৃত শ্রমিকদের স্বজনেরা ক্ষতিপূরণ পান।

[১৯] ক্ষতিপূরণ জটে মৃত শ্রমিকদের স্বজনরা, দৈনিক প্রথম আলো, ২৯ অক্টোবর ২০১৭।

মৃত শ্রমিকদের স্বজনেরা বলছেন, দূতাবাসে কাগজপত্র পাঠানো পর্যন্ত কাজগুলো দ্রুত আগায়, কিন্তু সমস্যার সুরাহা হয় না। প্রিয়জন হারিয়েছেন এমন কমপক্ষে ১০ জনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, "তাঁরা নিয়ম অনুযায়ী সব কাগজপত্র প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে জমা দিয়েছেন। কল্যাণ বোর্ড বাংলাদেশ দূতাবাসের কাছে সেই কাগজপত্র পাঠিয়েছে বলেও তাঁরা নিশ্চিত হয়েছেন, কিন্তু তারপর আর কোনো খবর পাচ্ছেন না।"

চা শিল্প : শ্রমিকদের মাঝে খাদ্যাভাব

চা খাতে ২০১৭ শ্রমিক অসন্তোষ ভিন্নমাত্রা পায়। শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধি বা কর্মপরিবেশের জন্য আন্দোলন না করলেও বিভিন্ন বাগানে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য পরিস্থিতি নিরসনের দাবিতে বিক্ষোভ করতে দেখা যায়।

বর্তমানে চা শিল্পে শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি সর্বোচ্চ ৮৫ টাকা। এ ছাড়া তারা দুই টাকা কেজি ধরে ১৩ কেজি আটা পেয়ে থাকেন। অন্যদিকে, সিলেটের পার্শ্ববর্তী ভারতের আসামে চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি এখন ১৩৭ রুপি। আসামে মাসে একজন শ্রমিককে ৩৫ কেজি চাল/গম দেয়া হয় ৫৪ পয়সা দরে। তবে ২০১৭ সালে বিভিন্ন বাগানে একটি অগ্রগতি ঘটেছে তা হলো–আইনে ছুটির দিনের মজুরি প্রদান বাধ্যতামূলক হলেও কেবল সম্প্রতি তা কার্যকর হয়েছে। এই সুবিধার জন্য এ বছর বিভিন্ন চা বাগানের শ্রমিকরা সংশোধিত শ্রম আইন-২০১৩ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করেছিলেন।

বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ মৌলভীবাজার জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক রজত বিশ্বাস জানান, সাপ্তাহিক বন্ধের দিনের মজুরিই কেবল নয় শ্রম আইনে ২(১০) ধারায় গ্রাচ্যুইটি, ৪ ধারায় চাকুরি স্থায়ী করা, ৫ ধারায় পরিচয়পত্র ও নিয়োগপত্র, ৬ ধারায় সার্ভিস বই, ১০৮ ধারায় অতিরিক্ত কাজের দ্বিগুণ মজুরি প্রদান বাধ্যতামূলক হলেও কর্তৃপক্ষ তা বাস্তবায়ন করতে গড়িমসি করছে। এদিকে চা বাগানগুলোতে শ্রমিকদের জীবন অপরিবর্তিত থাকলেও বদলে যাচ্ছে সেখানে মালিকানার ধরন। এক সময়ে যেখানে আধিপত্য ছিল বিদেশি কোম্পানি এবং ব্যক্তিদের এখন সেখানে আধিপত্য দেশি মালিকদের। দেশের অধিকাংশ চা বাগানই এখন বাঙালিরা পরিচালনা করছেন।

বর্তমানে দেশে চা বাগানের সংখ্যা ১৬৭টি। তার মধ্যে সিলেট জেলায় ২০টি, মৌলভীবাজার জেলায় ৯৩টি, হবিগঞ্জে ২২টি, চট্টগ্রামে ২৩টি, পঞ্চগড়ে ৭টি, রাঙামাটিতে ১টি এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১টি বাগান রয়েছে।

দেশে বিদেশী মালিকানাধীন বাগানের সংখ্যা মাত্র ২০টি বলে জানা যায়। তার মধ্যে ডানকান ব্রাদার্সের ১৬টি, দেউন্ডি গ্রুপের ৩টি এবং নিউ সিলেট টি কোম্পানির নামে ব্রিটিশদের বাগান আছে একটি। ডানকান ব্রাদার্সের মালিকানাধীন বাগানগুলো হচ্ছে-চাকলা পুঞ্জি, আমু, নালুয়া, চানপুর, আলীনগর, শমসের নগর, চাতলাপুর, ইটা, করিমপুর, পালাকান্দি, লংলা, রাজকী, সিলুয়া, হিংগাজিয়া, মাইজদিহি এবং লস্করপুর। দেউন্ডি গ্রুপের বাগানগুলো হচ্ছে– মৃতিঙ্গা, দেউন্ডি ও লালচান্দ এবং দি নিউ সিলেট টি কোম্পানীর মালিকানাধীন রয়েছে ফুলতলা চা বাগান। বাংলাদেশ সরকারের মালিকানায় আছে ১৫টি চা বাগান। এর মধ্যে ন্যাশনাল টি কোম্পানি (এনটিসি) পরিচালনা করছে ১৩টি বাগান এবং বাংলাদেশ টি বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ২টি বাগান। সরকারের মালিকানায় যাওয়া বাগানগুলো একসময় ব্যক্তি মালিকানায় ছিল। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, দেশভাগের সময় অনেক বাগান পাকিস্তানিদের হাতে বিক্রি করে ব্রিটিশরা চলে যায়। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর পাকিস্তানি মালিকরা ফিরে না আসায় তাদের মালিকানাধীন বাগানগুলো এবং একাধিক হিন্দু বাগান মালিক পশ্চিমবঙ্গে চলে যাওয়ায় সেই বাগানগুলোও পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ১৩১টি বাগান স্বদেশিরা পরিচালনা করছে। এই বাগানগুলো প্রাইভেট কোম্পানি ও ব্যক্তিমালিকানায় রয়েছে। শিল্পপতি সাফওয়ান চৌধুরীর কোম্পানির মালিকানায় রয়েছে সর্বাধিক ৮টি বাগান। আর শিল্পপতি রাগীব আলীর মালিকানায় থাকা বাগানের সংখ্যা ৫টি।

বর্তমানে বাংলাদেশে চায়ের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। যা বছরে প্রায় ৭০-৭৫ মিলিয়ন কেজি। ১৯৭১ সালে ছিল মাত্র ৫ দশমিক ৭ মিলিয়ন কেজি। অন্যদিকে ১৯৮০ সালে চা উৎপাদিত হয়েছিল মাত্র ৪০ মিলিয়ন কেজি। ২০১৬ সালে মোট ৮৫ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদন হয়েছে দেশীয় বাগানগুলোয়, যা আগের বছরের তুলনায় ১ কোটি ৭৬ লাখ ২০ হাজার কেজি বেশি। চায়ের উৎপাদন ও চাহিদা এভাবে দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবেই এই খাত পূর্বের তুলনায় লাভজনকও হয়ে উঠেছে। কিন্তু শ্রমিকদের মজুরি ও সুযোগ-সুবিধা সেই তুলনায় খুবই অপ্রতুল। ২০১৭-এর ১২ জানুয়ারি চা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে যেয়ে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেছেন, চা-শিল্পে কর্মরত পাঁচ লাখের বেশি শ্রমিকের মজুরি মানসম্মত জীবনযাপনের জন্য যথেষ্ট নয়। দেশের প্রথম চা প্রর্শনীর

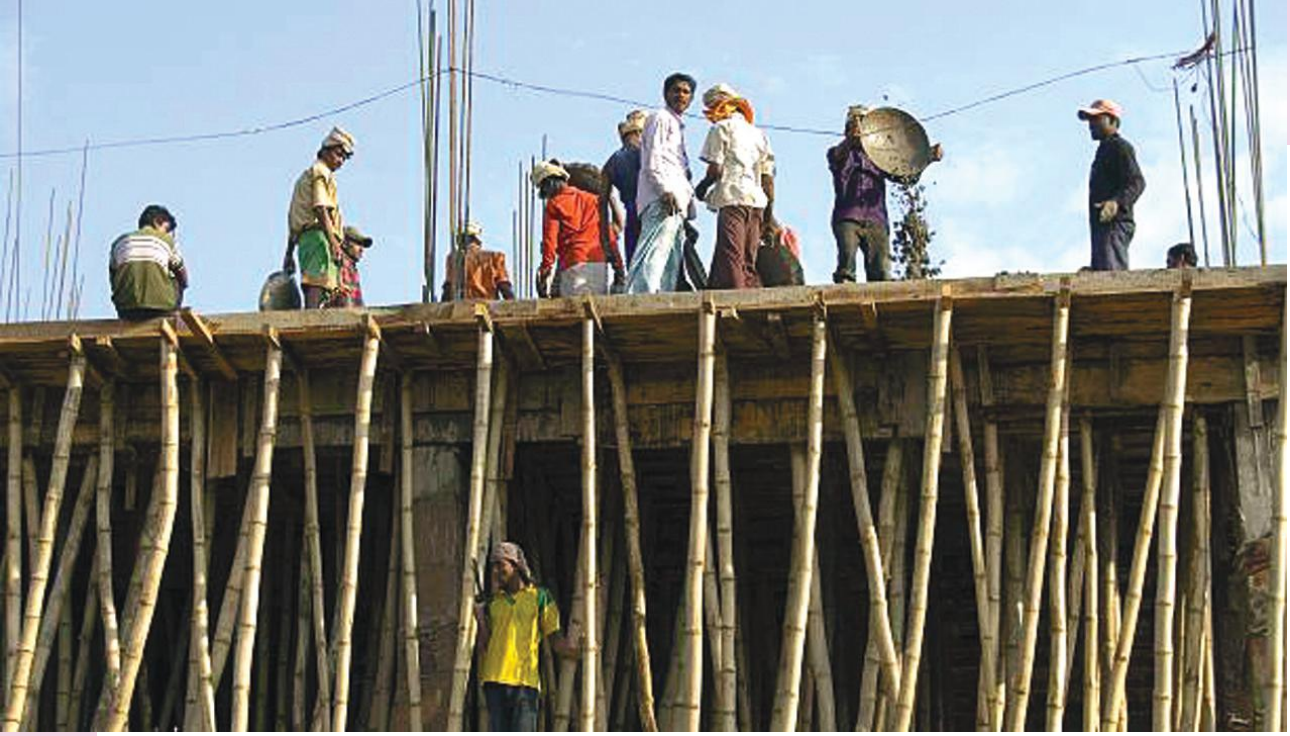

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ মন্তব্য করেন তিনি।

নির্মাণ খাত : ঝুঁকি নিয়েই কাজ করেন শ্রমিকরা

নির্মাণ খাত এ বছরও বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন তৎপরতার কেন্দ্রে অবস্থান করছিল। পদ্মা বহুমুখী সেতু, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, এলিভেটেড এক্সপ্রেস হাইওয়ে, নতুন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং মেট্রোরেল প্রকল্পের মত মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের পথে থাকায় দেশে নির্মাণ শিল্পখাত বিকাশের অপার সুযোগ তৈরি হয়েছে। ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশ এবং রিয়েল এস্টেইট এন্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব)-এর হিসাবে সারাদেশে ইমারত নির্মাণ শ্রমিকের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৩৫ লাখ। এই খাতে পেশাগত দুর্ঘটনার হারও অত্যধিক লক্ষ্য করা যায়।

২০০৬ সালের জাতীয় বিল্ডিং কোড অনুযায়ী, কাজের সময় একজন শ্রমিকের মাথায় হেলমেট পরা বাধ্যতামূলক। যারা কংক্রিটের কাজে যুক্ত, তাদের হাতে দস্তানাও পরতে হবে। চোখের জন্য ক্ষতিকর কাজ যেমন ড্রিলিং, ওয়েল্ডিং, ঢালাইয়ের সময় শ্রমিকদের চশমা ব্যবহার এবং ভবনের উপরে কাজ করার সময় নিরাপত্তা বেল্ট ব্যবহারও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ন্যাশনাল বিল্ডিং কোডে। গ্যাস কাটার ব্যবহারের সময় রক্ষামূলক সরঞ্জাম যেমন দস্তানা, নিরাপত্তা বুট, এপ্রন ব্যবহারেরও নিয়ম রয়েছে। তবে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে দেখা গেছে, বেশিরভাগ জায়গায় উপেক্ষিত রয়েছে শ্রমিকদের এসব নিরাপত্তা করণীয়। সেইফটি এন্ড রাইটসের হিসাবে, ২০০৫ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত সারাদেশে ১ হাজার ১৯৬ জন নির্মাণ শ্রমিক মারা গেছেন কাজের সময় দুর্ঘটনায়। ২০১৭ সালের প্রথম এগার মাসে মারা গেছেন ১৩৭ জন।

ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক বলেন, ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, শ্রম আইন সব জায়গায় শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়ে বলা থাকলেও ঠিকাদার ও উপ-ঠিকাদাররা কখনও অবহেলা, কখনও অতি লোভের কারণে তা এড়িয়ে যান। তিনি বলেন, পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে, মালিক তার শ্রমিকদের নিরাপত্তায় সব ধরনের ব্যবস্থা নিবে। উপকরণ সরবরাহ করবে। কিন্তু নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি কিনতে টাকা খরচ হয়। তাই তারা এগুলো এড়িয়ে যায়।' শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরও বিষয়গুলো 'দায়সারাভাবে' দেখে বলে অভিযোগ করেন রাজ্জাক।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এক্ষেত্রে নিয়মিত নির্মানস্থলগুলো পরিদর্শন ছাড়া পরিস্থিতির উন্নতি হবে না। পরিদর্শন হলে লোকজন জানবে যে বাড়ি করার সময় তা দেখার জন্য পরিদর্শক আসবে। যেকোন এলাকায় একটি বাড়িতে গিয়ে পরিদর্শন করলেও মানুষ বুঝে যায় যে শ্রমিকদের নিরাপত্তার নিয়ে আইনি বাধ্যবাধকতা আছে।

অন্যান্য খাতের মতো এই খাতেও শ্রমিকদের নিরাপত্তাসহ অন্যান্য সুবিধার বিষয় দেখার দায়িত্ব সরকারের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরেরও আছে। তবে সীমিত লোকবলের কারণে তারা এক্ষেত্রে পুরো মনযোগ দিতে পারছে না বলে জানানো হয়। অনুসন্ধানে দেখা যায়, তৈরি পোশাক খাত সরকারি পরিদর্শন বিভাগের নজরদারির কেন্দ্রে

থাকে বলে অন্যান্য খাতে ঠিকমত নজর দেওয়া তাদের জন্য কঠিন। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও চট্টগ্রামের পোশাক কারখানাগুলো নিয়েই তাদের ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। পরিদর্শন বিভাগের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, নির্মাণ খাতে সংঘটিত দুর্ঘটনার কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে–ভালো সিঁড়ি ও সিঁড়িতে পর্যাপ্ত আলোর অভাব; এলোমেলোভাবে রড, বালু ও ইট রাখা; কর্মক্ষেত্রে নেট না থাকা অথবা নাজুক নেটের ব্যবহার; কপিকলের ব্যবস্থা না থাকা; হেলমেট, দস্তানার ব্যবস্থা না করা; খালি পায়ে কাজ করা; প্রচন্ড রোদে কাজ করা; অসাবধানতা ও অসচেতনভাবে আবদ্ধ স্থানে প্রবেশ; ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতির ব্যবহার; বিশ্রাম কম নেয়া, দুর্বল মাচা, দেয়াল ও মাটি চাপা পড়া; ঝুলন্ত অবস্থায় কাজের সময় বেল্ট ব্যবহার না করা; ভালো জুতা ব্যবহার না করা; আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব; ত্রুটিপূর্ণ বৈদুত্যিক লাইন ইত্যাদি। এসব কারণে নির্মাণ খাতে প্রতিনিয়তই ঘটছে দুর্ঘটনা। এই খাতের মালিকরা প্রভাবশালী হওয়ায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিহত ও আহত শ্রমিক সঠিক ক্ষতিপূরণও পাচ্ছেন না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন আহত শ্রমিকরা।

পাথর এবং ইট ভাঙ্গা শ্রমিকদের সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত হওয়া অব্যাহত আছে

সংখ্যাগত বিচারে বাংলাদেশের বিশাল এক শ্রমখাত। একই সঙ্গে সবচেয়ে বেশি অবহেলিত শ্রমখাতগুলোরও একটি। দেশের সর্বত্র এই শ্রমিকরা আছেন। কেউ পাথর উত্তোলন, কেউ পাথর ভাঙ্গা এবং ইট ভাঙ্গার সঙ্গে যুক্ত তাঁরা। পাথর ও ইট ভাঙ্গারও অনেক ধরন রয়েছে। কোন কোন শ্রমিক হাতুড়ি ব্যবহার করে পাথর ভাঙ্গেন। অনেকে ক্রাশার মেশিনে পাথর বা ইট ভাঙ্গার কাজ করেন।

বাংলাদেশ ভারত থেকে বিপুল পাথর আমদানি করলেও অনেক নদী থেকেও এখানে পাথর উত্তোলন করা হয়। জাফলংয়ের পিয়াইন নদী থেকে পাথর উত্তোলন কাজে প্রায় এক লাখ শ্রমিক জড়িত। মূলত অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি এখানে পাথর উত্তোলন হয়। আবার আমদানিকৃত পাথরের ক্ষেত্রে দেখা যায় সেগুলো ভাঙ্গার জন্য স্থলবন্দরগুলোর আশেপাশে সুনির্দিষ্ট পরিবেশগত রক্ষাকবচ ছাড়াই শত শত শ্রমিক কাজ করছে। এইরূপ অনেক স্থানেই ক্রাশার মেশিন বা গ্রিন্ডার মেশিন থেকে সৃষ্ট পাথর ভাঙ্গার ধুলোয় শ্রমিকরা ফুসফুসের সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। ঢাকার বক্ষব্যাধী হাসপাতালের চিকিৎসকরা প্রথম এইরূপ শ্রমিকদের মাঝে সিলিকোসিস রোগের প্রাদুর্ভাব শনাক্ত করেন। লালমনিরহাটের পাটগ্রামে এরূপ রোগে কয়েক বছরের ব্যবধানে চার শতাধিক ব্যক্তিকে আক্রান্ত হতে দেখা গেছে– যাদের মধ্যে অন্তত ৬৫ জন ইতোমধ্যে মারাও গেছে। এ বিষয়ে সেইফটি এন্ড রাইটসের সহায়তায় ভুক্তভোগীরা শ্রম আদালতে এ পর্যন্ত ৬৫টি মামলাও দায়ের করেছেন। উল্লেখ্য, পাটগ্রামের বুড়িমারী স্থলবন্দর দিয়ে প্রতিদিন প্রায় ১০০ গাড়ি বিভিন্ন ধরনের পাথর নিয়ে আসে ভারত থেকে। আমদানিকৃত এসব পাথর ভাঙ্গা হয় মহাসড়কের আশেপাশেই। আর এ কাজে যুক্ত হয় স্থানীয় দরিদ্র শ্রমিকরা। প্রায় ১১ হাজার পাথর ভাঙ্গা

শ্রমিক রয়েছে এই এলাকায়।[১২] সচরাচর ৫০ কেজি ওজনের এক বস্তা পাথর গুঁড়া করার জন্য শ্রমিকরা ৫ থেকে ১০ টাকা পর্যন্ত পান। গড়ে প্রতি শ্রমিক দৈনিক ৪০-৫০ বস্তা পাথর গুঁড়া করেন। যেসব প্রতিষ্ঠান পাথর ভাঙ্গার কাজ করছে তাদের শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিয়ে কোন ভাবনা নেই, বাধ্যবাধকতাও নেই। এ বিষয়ে সরকারি কোন দপ্তরের তদারকিও নেই। অনুসন্ধানে এও জানা গেছে, বিপুল শ্রমিক প্রতিনিয়ত সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে চললেও তা শনাক্ত করা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার সামর্থ্য নেই স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। আবার দরিদ্র রোগীদের বিভাগীয় শহর বা রাজধানীতে এসে চিকিৎসা নেয়াও সম্ভব হয় না। এই রোগে আক্রান্তরা প্রথমে শ্বাসকষ্ট এবং পরে ক্রমে শুকিয়ে যেতে থাকেন।

পাথর ভাঙ্গার ধুলো থেকে সৃষ্ট স্বাস্থ্য সংকট ছাড়াও এই খাতের অনেক শ্রমিক পাথর উত্তোলনকালেও মারা যাচ্ছে। ২০১৭ সালের ১৮ মার্চ প্রকাশিত ডেইলি স্টারের এক সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয় যে, সর্বশেষ চার বছরে কেবল সিলেট জেলায় বিভিন্ন নদী থেকে পাথর উত্তোলনকালে ভূমিধসে ৬০ জন শ্রমিক মারা গেছে। একই সম্পাদকীয় থেকে জানা যায় যে, কেবল সিলেটের বিভিন্ন উপজেলায় পাথর ভাঙ্গার জন্য ৩৯৭টি ক্রাশার মেশিনের ব্যবহার লক্ষ্য করেছেন সরেজমিন অনুসন্ধানকারীরা।

এদিকে বাংলাদেশ প্রতিদিন ২০১৭ সালের ১০ জুন এক প্রতিবেদনে লিখেছে, প্রাণঘাতী ব্যাধি সিলিকোসিসের ঝুঁকিতে রয়েছেন কেবল পঞ্চগড়েই প্রায় ৫০ হাজার পাথর শ্রমিক। এর অর্ধেকের বেশি নারী। সঠিকভাবে রোগ নির্ণয়ের অভাবে এ রোগে সেখানে নিয়মিত মারা যাচ্ছেন অনেকে।

অন্যদিকে, পাথর ভাঙ্গা শ্রমিকদের চেয়েও সংখ্যায় ব্যাপক রয়েছে ইটভাঙ্গা শ্রমিকরা। ইটভাঙ্গা শ্রমিকরা কখনো দিন হিসাবে–কখনো আবার বর্গফুট হিসাবে কাজ করেন। বড় বড় শহরে ৮-৯ ঘন্টা খেটে ৩-৫ শ' টাকা পর্যন্ত আয় হয়। শহর থেকে দূরবর্তী এলাকাগুলোতে মজুরি আরও কম। অনেক শিশু শ্রমিকও অপ্রাতিষ্ঠানিক এই খাতে যুক্ত।

[১২] ২৮ সেপ্টেম্বর, ঢাকা ট্রিবিউন, ঢাকা।

৫

শ্রম আন্দোলন ২০১৭
দুটি কেসস্টাডি

চামড়া শিল্পের স্থানান্তরঃ শ্রমিকরা বহু সমস্যায় পড়েছে

ঢাকার হাজারিবাগকেন্দ্রীক বাংলাদেশের চামড়া শিল্পে প্রায় ২৫ হাজার শ্রমিক নিযুক্ত ছিল। ২০১৭ সালে শিল্প শ্রমিকদের জগতে সবচেয়ে বিপর্যয়কর অবস্থায় পড়ে চামড়া শিল্পের ঐ শ্রমিকরা। হাজারিবাগ থেকে এই শিল্পকে সাভারের হেমায়েতপুরে স্থানান্তর করা হলে বিপন্ন অবস্থায় পড়ে হাজার হাজার মানুষের কয়েক দশকের পেশাগত জীবন। এসময় শিল্প মালিকদের সরকার কারখানা পুনঃস্থাপনের জন্য প্লট দিলেও শ্রমিকদের বসবাসের কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি। ফলে যেসব শ্রমিক হাজারিবাগে পরিবার-পরিজনসহ ছিল তারা সাভারে চলে যেতে পারছিল না। আবার মালিকদের প্লট দেয়া হলেও শুরুতে অনেক প্লটেই কারখানা চালু করার মতো অবকাঠামো, বিদ্যুত, গ্যাস, পানির সংযোগ ছিল না। ফলে এসব কারাখানায় শ্রমিকদের দীর্ঘদিন কর্মহীন থাকতে হয়। এভাবে ট্যানারি স্থানান্তর এখাতের শ্রমিকদের জন্য শুরুতে অবর্ণনীয় সমস্যা বয়ে আনে। কেবল ২০১৭ সালের মাঝামাঝি এসে সেখানে বিদ্যুত-গ্যাস-পানির সরবরাহ স্বাভাবিক হয়। কিন্তু শ্রমিকদের জন্য জরুরি অনেক বিষয়ে সমস্যা রয়েই গেছে। পুরো এলাকায় সলিড বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কোন সুরাহা হয়নি এবং শিল্প এলাকার রাস্তাঘাটও চলাফেরার অত্যন্ত অনুপযোগী।

নতুন চামড়া শিল্প নগরীতে শ্রমিকরা কেমন আছে সে বিষয়ে ২০১৭ সালের ২৮ আগস্ট এক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে 'সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম)'। 'র‍্যাপিড এসেসমেন্ট অব হাজারীবাগ ট্যানারিজ' শিরোনামে ঐ গবেষণার ফল তুলে ধরে প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ড. বজলুল খন্দকার জানান[১৩], সাভারে জীবন ধারণের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় উপাদান আবাসন, হাসপাতাল, স্কুল ও ক্যান্টিন সুবিধা নেই বলে স্থানান্তরিত শ্রমিকদের ৯২ শতাংশ তাদের কাছে অভিযোগ করেছেন। এছাড়া স্থানান্তরকালে জুলাই-অগাস্টের বেতনসহ ট্যানারি মালিকদের থেকে কোনো ক্ষতিপূরণ পায়নি প্রায় ৯৫ শতাংশ শ্রমিক। এই গবেষণা সংস্থার পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, পরিবার নিয়ে দারিদ্র্যসীমার উপরে বাস করতে যেখানে একজন ট্যানারি শ্রমিকের মাসিক বেতন ন্যূনতম ১১ হাজার ১৩০ টাকা হওয়া প্রয়োজন, সেখানে শ্রমিকদের অনেকের সর্বনিম্ন বেতন পাঁচ হাজার টাকাও রয়েছে।

উল্লেখ্য, ট্যানারি শিল্প ঢাকার পরিবেশ ও পাশ্ববর্তী নদী দূষণ করছিল ব্যাপকভাবে। তারই প্রেক্ষিতে দেশের উচ্চ আদালত ২০১৭ সালের মার্চ পর্যন্ত এই শিল্প মালিকদের সময় বেঁধে দেয় তাদের জন্য গড়ে ওঠা নতুন শিল্পপল্লী সাভারের হেমায়েতপুরে চলে যেতে। মালিকরা এই সময়সীমা অগ্রাহ্য করলে আদালত পরিবেশ অধিদপ্তরকে নির্দেশ দেয় কারখানাগুলোর গ্যাস-বিদ্যুত-পানির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে। ৮ এপ্রিল এভাবে ২০৫টি কারখানার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। ফলে ঐসব কারখানার শ্রমিকরা তাৎক্ষণিকভাবে কর্মহীন হয়ে পড়ে।

এসময় একদিকে কিছু কারখানা স্থানান্তর হলেও নতুন শিল্প এলাকায় শ্রমিকদের আবাসন, তাদের সন্তানদের পড়ালেখা, চিকিৎসা ইত্যাদির কোন ব্যবস্থা না থাকায় সেখানে তারা যোগ দিতে পারছিল না। আবার কর্মহীন অবস্থায় হাজারিবাগে অবস্থান করাও সম্ভব হচ্ছিলো না। মালিকদের পক্ষ থেকে অভিযোগ ওঠে, হাজারিবাগে

[১৩] http://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article1386374.bdnews

ব্যবসা ছিল এমন ৪৫টি প্রতিষ্ঠান হেমায়েতপুরে প্লটই পায়নি। স্বভাবত এইরকম প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে পড়ায় সেখানে কর্মরত শ্রমিকরাও কর্মহীন হয়ে পড়ে।

সর্বশেষ অনুসন্ধানে দেখা যায়, প্রায় ৯২টি কারখানা ওখানে কাজ শুরু করেছে। শ্রমিকদের একটা বড় অংশ হাজারিবাগ এলাকা থেকে প্রতিদিন সাভার যাতায়াত করছে। এই যাতায়াতকালেই তাদের দৈনিক আয়ের অন্তত এক চতুর্থাংশ অর্থ খরচ হয়ে যাচ্ছে। অল্প সংখ্যক শ্রমিক হেমায়েতপুরেও থাকছে। ওখানে যারা থাকছে তাদের অবস্থা খুব খারাপ। বিশেষ করে বাসা ভাড়া হাজারিবাগের তুলনায় প্রায় দিগুণ। প্রাথমিক চিকিৎসার কোন ধরনের ব্যবস্থা নেই। খাবার সংকটও রয়েছে।

ট্যানারি স্থানান্তরের পুরো প্রক্রিয়ায় এবং নতুন ট্যানারি পল্লী গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় শ্রমিকদের বিষয় মাথায় রাখা হয়নি বলেই লক্ষ্য করা যায়। মালিকরা স্থানান্তরের বিনিময়ে জমি পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন এবং বিনামূল্যে কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধণাগারও পাবেন বলে সরকার অঙ্গীকার করেছে। অথচ যে শ্রমিকদের হাত ধরে ২০১৫-১৬ অর্থবছরেও এই খাত ১১৬ কোটি ডলারের পণ্য রফতানি করেছে সেই শ্রমিকদের জন্য স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় কোন পদক্ষেপই ছিল না। ২০১৬-এর ১৯ জুন ট্যানারি মালিকদের সঙ্গে শ্রমিকদের এই মর্মে চুক্তিও হয়েছিল যে, শিল্প স্থানান্তর হলে শ্রমিকদের আবাসনের ব্যবস্থা মালিকরাই করবে। সেই চুক্তি প্রতিপালিত হয়নি। একই চুক্তিতে সাভারে স্থানান্তরের পর শ্রমিকদের চাকুরির ধারাবাহিকতা যাতে রক্ষিত হয় সেই দাবিও ছিল। চামড়া শিল্পের সিংহভাগ শ্রমিককেই দশকের পর দশক ধরে অস্থায়ীভিত্তিতে কাজ করানো হয়। ফলে স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় মালিকদের পক্ষে সহজেই এসব শ্রমিকের অনেককে চাকুরিচ্যুত করা সম্ভব হয়।

অনেকেই মনে করছেন, শ্রমিকদের প্রতি অবহেলা ও তাদের ন্যায্য অধিকারের বঞ্চনা অতি সম্ভাবনাময় এই শিল্পের বিকাশের পথে এক বড় অন্তরায়। উপরে উল্লিখিত গবেষণায় সানেম বলেছে, 'পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাপনা ও মানসম্মত টেকসই অবকাঠামো নিশ্চিত করা গেলে এই খাতের রফতানি আয় ৫০০ কোটি ডলার হতে পারে।'

উল্লেখ্য, ১৯৯০ সালের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশ শুধু চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার প্রথম ধাপ ওয়েট ব্লু করলেও পরে পরবর্তী ধাপের (ক্রাস্ট ও ফিনিশড) কাজগুলোও হতে থাকে। ২০০০ সালের পরে দেশে চামড়াজাত পণ্য তৈরির শিল্পও গড়ে উঠতে শুরু করে। এখন চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি দেশের দ্বিতীয় প্রধান রপ্তানি খাত। ধারণা করা হচ্ছে, পাঁচ বছর পরে বাংলাদেশের

২০ শতাংশ মানুষও যদি বছরে এক জোড়া জুতা বা স্যান্ডেল কিনতে গড়ে ২ হাজার টাকা ব্যয় করেন, তাহলেও দেশেই এই খাতের ৭-৮ হাজার কোটি টাকার বাজার তৈরি হবে, যা প্রায় ২ বিলিয়ন ডলারের সমান। অন্যদিকে চীনের রপ্তানি বাজারের ৫ শতাংশ বাংলাদেশে এলে রপ্তানি আয় ১০ বিলিয়ন ডলার ছাড়াবে। চামড়া খাতে বাংলাদেশের বড় শক্তি হলো এই শিল্প সম্পূর্ণ দেশজ কাঁচামালভিত্তিক।

চুনারুঘাটে আবাদি জমি রক্ষায় চা শ্রমিকদের আন্দোলন

হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে দুটি চা বাগানে শ্রমিকদের আবাদি জমি রক্ষার আন্দোলন এ বছরও মৃদুলয়ে অব্যাহত ছিল। তবে সরকারি তরফ থেকে জমি দখলের আয়োজন স্থিতিমিত হওয়ায় শ্রমিকদের পক্ষেও আন্দোলন স্থিতিমিত হয়ে এসেছে। ২০১৫-১৬ সাল থেকে এই আন্দোলনের সূত্রপাত, যখন স্থানীয় চান্দপুর ও বেগম খান বাগানের ৫১১ একর কৃষি জমি সরকার বিশেষ ইকোনমিক জোন করার জন্য 'বাংলাদেশ ইকোনমিক জোন অথরিটি (বেজা)কে দেয়।

এইরূপ বরাদ্দ দেয়ার ক্ষেত্রে সরকার উপরোক্ত জমিকে খাস ও পতিত হিসেবে দেখালেও কার্যত তা ছিল ডানকান নামের চা বাগান কর্তৃপক্ষের লীজ নেয়া জমি। চা শ্রমিকরা বাগান কর্তৃপক্ষ থেকে বরাদ্দ নিয়ে এই জমিতে প্রায় দেড় শত বছর ধরে কৃষি কাজ করছে। যেহেতু চা শ্রমিকরা বাগানে কাজ করে সামান্য মজুরি পায় সে কারণে বাগানকর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের খাদ্য নিরাপত্তার স্বার্থে বাগানের সমতল জমিতে কৃষি কাজ করতে দেয়। এইরূপ কৃষি কাজ ছাড়া শ্রমিক

কৃষি জমি রক্ষায় চা শ্রমিক সন্তানরাও মিছিলে নামে

পরিবারগুলোর খাবারের সংকট তীব্র হয়ে উঠে। ফলে সরকার যখন বেগমখান ও চান্দপুর বাগানের আবাদি জমিগুলো অর্থনৈতিক জোন করার জন্য নিয়ে নিতে সচেষ্ট হয় তখন চুনারুঘাট অঞ্চলের সকল চা শ্রমিক একত্রিত হয়ে তার প্রতিবাদ জানায়। এই লক্ষ্যে তখন তাৎক্ষণিকভাবে গঠিত হয় 'চা বাগান ভূমি রক্ষা কমিটি।' এই কমিটি বেজা কর্তৃক জমি নিয়ে নেয়া বন্ধ করার দাবিতে প্রধানমন্ত্রী বরাবরেও স্মারকলিপি দিয়েছিল। সরেজমিনে দেখা গেছে, ২০১৭ সালেও বেজা কর্তৃপক্ষ জমিতে দখল কায়েম থেকে বিরত রয়েছে এবং সে কারণে শ্রমিকরাও মিছিল সমাবেশ করা কমিয়ে দিয়েছে। তবে যে কোন সময় জমি দখলে নেয়ার চেষ্টা হলেই শ্রমিকরা আবার আন্দোলন শুরু করবে বলে জানা যায়। কারণ জমি দখল কার্যক্রম নজরে না এলেও সরকারি কর্মকর্তারা মাঝে মাঝেই বলে থাকেন, এখানে ইকোনমিক জোন হবেই। উল্লেখ্য, এই আন্দোলনের সমর্থনে ঢাকার 'সর্বপ্রাণ' সাংস্কৃতিক মঞ্চ চুনারুঘাট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক দফায় সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করে বিষয়টি জাতীয় মনযোগে আনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

৬

শ্রম ও কর্মসংস্থান খাত

জাতীয় বাজেট পর্যালোচনা

বাজেট: পদ্ধতি ও তথ্যগত বিবেচনা

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ'। তবে জাতীয় জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বাজেট কোথায়, কাদের দ্বারা এবং কখন প্রণীত হয় তা দেশের সাধারণ মানুষ সামান্যই জানেন। শ্রমিকদের পক্ষেও সেটা জানা দুঃসাধ্য।

দেশের অর্থমন্ত্রী ২০১৭ সালের বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলেন, বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক করতে কৃষক থেকে শুরু করে সচিব পর্যন্ত বিভিন্ন মহলের সঙ্গে সীমিত পরিসরে হলেও সংলাপে গিয়েছিলেন তাঁরা। তাঁর ভাষায় 'এমনকি আমরা শিশুদের সঙ্গেও মত বিনিময়ে করেছি।'[১৪] শ্রমজীবীদের কোন প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন বা ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে এইরূপ কোন সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়নি। অর্থাৎ বাংলাদেশের বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় শ্রমিকরা কোন পক্ষ নয় আজো।

বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী এ এম এ মুহিত জানিয়েছেন, দেশে মাথাপিছু আয় বর্তমানে (২০১৭ সালে) গড়ে ১ হাজার ৬০২ মার্কিন ডলার। যা প্রায় এক দশক পূর্বে (২০০৫-০৬ অর্থ বছরে) ছিল ৫৪৩ মার্কিন ডলার। অর্থাৎ এক দশক পূর্বে দেশে একজন মানুষের মাথাপিছু মাসিক গড় আয় ছিল প্রায় ৪৫ ডলার। যা বর্তমানে প্রায় ১৩৩ ডলার। লক্ষ্যণীয়, একই সময়ে শ্রমিকদের (উদাহরণ হিসেবে গার্মেন্ট শ্রমিকদের) ন্যূনতম মজুরি ছিল মাসিক প্রায় ২২-২৩ ডলার (১৬৬২ টাকা) এবং এখন তা ৬৬ ডলার (৫৩০০ টাকা)। অর্থাৎ সবচেয়ে অধিক প্রবৃদ্ধির শিল্প খাতের শ্রমিকদের গড় আয় বর্তমান বাংলাদেশে জাতীয় গড় আয়ের প্রায় অর্ধেকে অবস্থান করছে।

অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় এও বলেছেন, গত এক দশকে দেশে 'হতদরিদ্র' ও 'দরিদ্র' মানুষের সংখ্যা অনেক কমেছে। বর্তমানে (২০১৭ সালে) দরিদ্র মানুষের সংখ্যা জনসংখ্যার ২৩.২ শতাংশ এবং হতদরিদ্র মানুষ হলো ১২.৯ শতাংশ। যা এক দশক পূর্বে ছিল যথাক্রমে

[১৪] বাজেট বক্তৃতা, পৃ.৬।

৩৮.৪ এবং ২৪.২ শতাংশ। উল্লেখ্য, হতদরিদ্র ও দরিদ্র মানুষের সংজ্ঞা দিতে যেয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য শামসুল আলম দেশের একটি দৈনিককে বলেছেন,[১৫] মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী, একজন ব্যক্তিকে দৈনিক ২১২২ ক্যালরি খাদ্য খেতে হয়। এর জন্য যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন (আনুমানিক প্রায় তিন হাজার টাকা), ওই ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের পরিবার যদি সেই আয় করতে সক্ষম না হন, তবে তিনি/তাঁরা দরিদ্র। সেই হিসাবে, দারিদ্র্যসীমার ওপরে উঠতে হলে বর্তমান বাজারে চার সদস্যের একটি পরিবারকে মাসে কমপক্ষে বারো হাজার টাকা আয় করতে হবে। অন্যদিকে একজন ব্যক্তি যখন দৈনিক ১৮০৫ ক্যালরি খাদ্য কেনার অর্থ (আনুমানিক প্রায় ১ হাজার ৬০০ টাকা) সংস্থান করতে পারেন না–তখন তিনি হতদরিদ্র। অর্থাৎ চার সদস্যের একটি পরিবার যদি মাসে ৬ হাজার ৪০০ টাকা আয় করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তাদের হতদরিদ্র বলা যায়। উপরোক্ত সংজ্ঞায়ন থেকে সাধারণভাবে অনুমান করা যায়, দেশের দরিদ্র ও হতদরিদ্র পরিবারগুলোর মাঝে শ্রমিক পরিবারগুলোর সংখ্যাই অধিক।

বাজেট: শ্রমিকদের জন্য বরাদ্দগত বিবেচনা

২০১৭-১৮ সালের জাতীয় বাজেটে মোট বরাদ্দ ছিল ৪,০০,২৬৬ কোটি টাকা। আর এর মধ্যে শ্রম ও

[১৫] ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, প্রথম আলো।

কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল ২৬২ কোটি টাকা! কৌতুহলউদ্দীপক দিক হলো, বাজেটে জাতীয় বরাদ্দ বৃদ্ধি পেলেও শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ কমে গেছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে জাতীয় বরাদ্দ ছিল ৩,৪০,৬০৫ কোটি। আর শ্রম ও কর্মসংস্থানের জন্য উক্ত বছরে বরাদ্দ ছিল ৩০৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ জাতীয় বরাদ্দ পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রায় ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও শ্রম মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ প্রায় ১৫ শতাংশ কমে যায়। পর্যবেক্ষণে এও দেখা যায়, সর্বশেষ অর্থ বছরে দেশের সবগুলো মন্ত্রণালয়ের চেয়ে শ্রম মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ কম ছিল! শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত অপর মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে অবশ্য চিত্রটা সামান্য পৃথক। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ ৫৬০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৬৮৮ কোটি টাকা করা হয়।

লক্ষণীয়, শ্রম মন্ত্রণালয় বা প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় উভয় ক্ষেত্রেই, প্রায় প্রতি বছরই বাজেট বরাদ্দ সংশোধিত হয়ে কমে যায়। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য ২০১৬ সালে ৫৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ থাকলেও সংশোধিত বাজেটে তা হয়ে যায় ৪৮১ কোটি টাকা। শ্রম মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রেও উক্ত বছর মূল বরাদ্দ ৩০৭ কোটি টাকা থাকলেও সংশোধিত বাজেটে তা ২৯০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

উল্লেখ্য, সাধারণভাবে যদিও অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন, বাংলাদেশের মতো দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট বরাদ্দে অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত কৃষি, স্বাস্থ্য এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান ইত্যাদি খাত, অথচ বাস্তবে বাজেটে অগ্রাধিকার পেয়েছে প্রতিরক্ষা, অবকাঠামো নির্মাণ, জ্বালানি ইত্যাদি খাত।

অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যেসব 'ঘোষণা' রয়েছে

ক. নগরায়ন প্রক্রিয়ায় নির্মাণ ও পরিবহন খাতে শ্রমঘন কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

খ. তৈরি পোশাক খাত বিকাশে চলমান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। ফলে এখানে মহিলা কর্মী নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

গ. শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

ঘ. সকল উপজেলায় কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও বিদ্যমান কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো আধুনিকায়ন করার পরিকল্পনা নেয়া হবে।

ঙ. ২২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সকল দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনে 'ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এনএসডিএ) মন্ত্রিসভায় অনুমোদন হয়েছে। বর্তমানে এনএসডিএ গঠনের লক্ষ্যে আইনের খসড়া প্রণয়ন চলছে।

চ. জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল (এনএইচআরডিএফ) হবে। মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের পর কোম্পানি হিসেবে এটি রেজিস্ট্রেশন হবে।

ছ. চা শ্রমিকদের জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচি খাতে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ এবং খাদ্য দ্রব্যাদির পরিবর্তে জনপ্রতি এককালীন নগদ ৫ হাজার টাকা দেয়া হবে।

জ. বিদেশী মিশনগুলোতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছর থেকেই মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু হবে।

ঝ. জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের জন্য 'বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ আইন' প্রণয়নের কাজ চলছে। এছাড়া এই খাতের শ্রমিকদের সুরক্ষায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা গড়ার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

বাজেটে শ্রমিকদের নিম্নোক্ত দাবি-দাওয়া সম্পর্কে দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়নি[১৬]

গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলনের পক্ষ থেকে প্রতি বছরের মতো ২০১৭ সালেও বাজেট উত্থাপনকালে সরকারের কাছে নিম্নরূপ বিষয়গুলো উত্থাপন করা হয়:

এক. আর্থিক অসমতা দূর করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ

অর্থনীতি যত বিকশিত হচ্ছে, আর্থিক সুবিধা ও সম্পদ ততই সমাজের সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর মাঝে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। ফলে জাতীয়ভাবে অর্থনৈতিক অসমতার চরম বিভেদ রেখা তৈরি হয়েছে এবং অসমতা ক্রমে বাড়ছে। এর অবসানে জাতীয় সম্পদ সংগ্রহ ও উন্নয়ন বরাদ্দের কৌশলে আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন।

দুই. কর্মসংস্থান প্রশ্ন

বিগত বছরগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এখনও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বাস্তব প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠছে না। ফলে কোটি কোটি তরুণ বেকার কিংবা ছদ্মবেকার।

তিন. মজুরি পরিস্থিতির উন্নয়ন ও মজুরি কমিশনকে শক্তিশালী করা

টেকসই উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের স্বার্থে মজুরি পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং মজুরি কমিশনের দক্ষতা বৃদ্ধি সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত

[১৬] সেইফটি এন্ড রাইটস বাজেটকালে শ্রমজীবীদের স্বার্থে এইরূপ একটি প্রস্তাব তুলে ধরেছিল।

কর্মকৌশল হওয়া জরুরি। একই সঙ্গে সরকারি কর্মচারিদের মতোই বেসরকারি খাতেও প্রতি বছর মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ১০-১৫ শতাংশ হারে মজুরি বৃদ্ধির বিধান করা সঙ্গত।

চার. কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ

শিক্ষার পরিসর বাড়লেও কর্মমুখী শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানমুখী প্রশিক্ষণকেন্দ্র এখনও অতি কম। যে কারণে বিদেশে কাজের সন্ধানে যারা যাচ্ছেন তাদের মাঝে স্বল্পদক্ষদের সংখ্যাই সর্বাধিক। আবার উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়লেও তাদের শিক্ষা–কর্মসংস্থানে তাদের সহায়তা করতে ব্যর্থ হচ্ছে। সরকার শিক্ষাখাতে যে বরাদ্দ দিয়ে থাকে তার আওতায় দেশে যুগোপযোগী কারিগরী প্রশিক্ষণকেন্দ্র বাড়ানো প্রয়োজন।

পাঁচ. কাজের সন্ধানে বিদেশ যাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ করা

প্রবাসী কর্মজীবী-শ্রমজীবীরা অর্থনীতির ভিত্তি হলেও এই খাতটি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও সুশাসনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেয়েছে এমনটি বলা মুশকিল। কাজের সন্ধানে বিদেশে যাওয়া অতি ব্যয়বহুল হয়ে পড়ছে। উপরন্তু বিদেশে বাংলাদেশীদের দুর্দশায় স্থানীয় বাংলাদেশ দূতাবাসের ভূমিকা নিয়ে প্রবাসী শ্রমিকরা অনেকেই ক্ষুব্ধ। দেশে আবাসন ও বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অগ্রাধিকারের বিষয়টিও এখনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত আকারে হাজির হয়নি।

ছয়. শ্রমজীবীদের যানবাহন সংকট ও আবাসন সংকট সমাধান

প্রধান প্রধান শহরগুলো শ্রমজীবীদের জন্য যানবাহন ও আবাসন সংকট প্রধান এক দুশ্চিন্তার বিষয়। প্রতিটি নগরে দিগন্ত পাল্টে যাচ্ছে হাউজিং সেক্টরের বিকাশে। কিন্তু স্বল্প আয়ের মানুষদের তাতে কোনই প্রবেশাধিকার নেই। রাষ্ট্র একদিকে স্বল্প আয়ের মানুষদের জন্য জনপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে এবং স্বল্প আয়ের মানুষদের জন্য ব্যাপকভিত্তিক আবাসন পরিকল্পনাও অনুপস্থিত।

সাত. নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরি

বাংলাদেশের শিল্পায়নের এক বড় আন্তর্জাতিক পরিচিতি গড়ে উঠেছে তার অনিরাপদ কর্মপরিবেশের কারণে। শিল্প স্থাপনায় যথাযথ নজরদারির অভাব এবং এ সংক্রান্ত আইন-কানুনের বাস্তবায়নহীনতা কলকারখানাগুলোতে দুর্ভাগ্যজনক ও বিপজ্জনক এক পরিস্থিতি কায়েম করেছে। সেইফটি এন্ড রাইটস-এর অনুসন্ধানে দেখা যায়, ২০১৬ এর জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত শুধু কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ৩৮২ জন শ্রমিক নিহত হয়েছে। মোট ২৫৮টি কর্মক্ষেত্রে এসব শ্রমিক মারা যায়। এইরূপ দুর্ঘটনার ব্যাপকতা নিরাপদ কর্মক্ষেত্রের জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরছে।

আট. শ্রমিকদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা

বাংলাদেশে বাজার ব্যবস্থাকে প্রায় পুরোই ব্যবসায়ী সমাজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ফলে স্বল্প আয়ের মানুষ মাত্রই সেখানে অসহায়। এক্ষেত্রে তাদের জন্য রেশন ব্যবস্থা অপরিহার্য। সরকার এক্ষেত্রে বড় বড় খাতগুলোর মালিক সমিতির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে এরূপ রেশন ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করতে পারে। বস্তুত এরূপ রেশনিংয়ের অভাবে পরিবারের আর্থিক সংকট সামাল দিতে না পেরে শ্রমজীবী পরিবারগুলোতে শিশুশ্রমিকের জন্ম হচ্ছে।

নয়. আর্থিক প্রবৃদ্ধিতে শ্রমিক হিস্যা এবং সামাজিক নিরাপত্তা

অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হিস্যায় শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করার সময় হয়েছে এখন। সরকার বাজেটে বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাতকে যেসব প্রণোদনা দিয়ে থাকে সেটার সুফলও ঐ খাতের শ্রমিকদের মাঝে কীরূপ হিস্যায় বন্টিত হচ্ছে সে বিষয়ে তদারকি ও আইনগত নির্দেশনা থাকা উচিত। এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বর্তমানে যে বিপুল সরকারি বরাদ্দ যাচ্ছে তাতে শ্রমিক পরিবারগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

দশ. ভূমিপ্রশ্ন

কর্পোরেট অর্থনীতির স্বার্থে আবাদী জমির অধিগ্রহণ চললেও গ্রামীণ মজুরদের বিকল্প কর্মসংস্থানে কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। বিষয়টি সরাসরি বাজেট বরাদ্দের সংঙ্গে যুক্ত না হলেও কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত নীতিগত বিষয় হিসেবে বাজেট সংক্রান্ত আলোচনায় আসা প্রয়োজন।

এগার. মাতৃত্বকালীন সুবিধার সম্প্রসারণ ও ডে-কেয়ার সেন্টার গড়ে তোলা

শ্রম আইন (২০০৬) অনুযায়ী কোন কারখানায় একজন নারী শ্রমিকের কর্মকাল ৬ মাস হলেই প্রসূতিকালে তিনি সবেতন ১৬ সপ্তাহ ছুটি পাওয়ার

অধিকারী–কিন্তু কার্যত তার পূর্ণ প্রতিপালনে অনিয়ম ঘটছে বলে প্রায়ই তথ্য মেলে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে বেসরকারি খাতকে রাষ্ট্রীয় প্রণোদনা দিয়ে হলেও এই নীতির বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে।

বার. শ্রমজীবী হাসপাতাল

বেসরকারি খাত নির্ভর চিকিৎসা ব্যবস্থায় স্বল্প আয়ের দরিদ্র শ্রমজীবীরা অসুস্থতার সময় অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং ধারদেনায় জড়িয়ে পড়ে। যা তাদের দারিদ্র্য পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটায়। জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে শ্রমজীবীদের অবদানকে বিবেচনায় নিয়ে এবং সার্বিক দারিদ্র্য পরিস্থিতির উন্নয়নের স্বার্থে প্রতিটি জেলায় অন্তত একটি করে এবং বিভাগীয় শহরে একাধিক সংখ্যায় আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন শ্রমজীবী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

তের. মৎস্য শ্রমিকদের সুরক্ষায় কোস্ট গার্ডের দক্ষতা উন্নয়ন ও চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানার পরিবেশ উন্নয়ন

জাতীয় আয়ে মৎস্য খাতের রয়েছে ৪-৫ শতাংশ অবদান। কিন্তু এই খাতের শ্রমিকদের সুরক্ষায় জাতীয় উদ্যোগ-আয়োজন অপ্রতুল। মৎস্য খাতের সম্প্রসারিত রূপ হিসেবে দেশে বর্তমানে শতাধিক মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা রয়েছে। খুলনা অঞ্চলকেন্দ্রীক এসব কারখানার শ্রমিকরাও শ্রম অধিকার বঞ্চনার শিকার। তাদের সুরক্ষায় ও জীবনমান উন্নয়নে কলকারখানা পরিদর্শন বিভাগ এবং নিম্ন মজুরিবোর্ডকে ব্যবহার করে সরকারের অনেক কিছু করার রয়েছে।

চৌদ্দ. সিএসআর কার্যক্রম সমন্বয়ে জাতীয়ভিত্তিক কাঠামো সৃষ্টি প্রয়োজন

ব্যবসায়ে লাভের একটা অংশ শ্রমজীবীদের কল্যাণে ব্যয় হবে এটাই সিএসআর (কর্পোরেটদের সামাজিক দায়িত্বশীলতা) ধারণার মূলকথা। বর্তমানে অনেক প্রতিষ্ঠান এইরূপ কার্যক্রমে সক্রিয় হলেও একে আরও সম্প্রসারিত করা ও সমন্বয়ের প্রয়োজন এবং পদ্ধতিগতভাবে কার্যক্রম পরিচালিত হলে এর সুবিধাভোগী হিসেবে শ্রমজীবীরা আরও উপকৃত হতে পারে। এক্ষেত্রে দেশের সকল সিএসআর কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে মালিক প্রতিনিধি-শ্রমিক প্রতিনিধি-সরকার প্রতিনিধি সমন্বয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বা সমাজসেবা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন।

বাজেট বরাদ্দ কী কাজে খরচ হচ্ছে : একটি মন্ত্রণালয়ের কেসস্টাডি

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে কয়েকটি দপ্তর, অধিদপ্তর। যার মধ্যে রয়েছে: শ্রম পরিদপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, নিম্নতম মজুর বোর্ড, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল ও শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন। এসব দপ্তর ও অধিদপ্তরের প্রধান প্রধান কাজের মধ্যে রয়েছে: শ্রম বিষয়ক নীতিমালা নির্ধারণ, ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন প্রদান ও সিবিএ নির্ধারণ, নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ, কলকারখানাকে কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত সনদ দেয়া এবং সেগুলো পরিদর্শন, শ্রম আদালত পরিচালনা, শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দেয়া ইত্যাদি।

অনুসন্ধানে দেখা যায়, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে শ্রম মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল ২০৩ কোটি টাকা। তার মধ্যে প্রায় ৯৪ কোটি টাকা এই মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বেতন ভাতা ও পেনশান ভাতা হিসেবে ব্যয় হয়েছে। যা প্রায় ৪৭ শতাংশ। বাকি অর্থে এই মন্ত্রণালয় যেসব কাজ করেছে (২০১৬-১৭) তার মধ্যে রয়েছে:[১৭]

১. প্রায় ২২ হাজার কল-কারাখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন। এসব পরিদর্শনকালে অনিয়ম পেয়ে প্রায় ৬-৭ হাজার মামলা দায়ের করা হয়েছে।

২. প্রায় ৩০০ ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন দেয়া হয়েছে এবং প্রায় ৩০টি কারখানায় নির্বাচনের মাধ্যমে সিবিএ নির্ধারণ করেছে।

৩. ৩০টির মতো শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র পরিচালনা করা হচ্ছে।

৪. প্রায় ৩ হাজার শ্রমিককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৫. ৭টি শ্রম আদালত ও একটি আপীল আদালতের মাধ্যমে বছরে প্রায় গড়ে ছয় হাজার মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।

৬. ৪-৫টি শিল্পে নিম্নতম মজুরি হারের সুপারিশ করা হয়েছে; এবং

৭. ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল গঠনে ভূমিকা রাখা ও শ্রম আইন সংশোধন সংক্রান্ত ভূমিকা রাখা হয়েছে।

[১৭] মন্ত্রণালয়ে এই সংক্রান্ত হিসাবটি রয়েছে তিন বছরের। সেখান থেকে গড়ে এক বছরের এই হিসাব অনুমান করা হয়েছে।

শ্রম আদালতে ১৬ হাজার মামলা নিষ্পন্ন হওয়ার অপেক্ষায়

সারাদেশে সাতটি শ্রম আদালত ও একটি আপীল আদালত রয়েছে। আর এসব আদালতে দৈনিক সমকালের ১ মে (২০১৭) প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৭ সালের মার্চ পর্যন্ত ১৬ হাজার ১১৫টি মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ছিল। এর মধ্যে কেবল ঢাকার তিনটি আদালতেই প্রায় ১৩ হাজার মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ছিল। চট্টগ্রামের দুটি আদালতে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে দুই হাজার মামলা।

৫-৬ কোটি শ্রমজীবী-কর্মজীবীর জন্য এত কম আদালত প্রকৃতই অপ্রতুল। দেশে ক্রমে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়লেও শ্রম আদালতের সংখ্যা বাড়ছে না। শ্রমিকদের দূরদূরান্ত থেকে ন্যায়বিচারের জন্য বিদ্যমান শ্রম আদালতগুলোতে আসতে হয়। যেমন, ফেঞ্চুগঞ্জের একজন শ্রমিককে মামলা করার জন্য যেতে হয় চট্টগ্রাম। শ্রমমন্ত্রীর আশ্বাস অনুযায়ী শিগগির রংপুর ও সিলেটে নতুন শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ঢাকার তিনটি শ্রম আদালতের একটি নারায়নগঞ্জ এবং একটি টঙ্গীতে স্থানান্তর করা হবে।

সাধারণত আদালতগুলোতে মজুরি ও ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত বিষয়েই মামলা হয় বেশি। শ্রমিকদের করা মামলা নিষ্পত্তিতে মালিকরা দীর্ঘসূত্রিতার কৌশল নেন। দেখা যায়, এক-দেড় লাখ টাকা পাওয়ার জন্য মামলা করে রায়ের জন্য অপেক্ষা করতে হয় বছরের পর বছর।

এই আদালতগুলো শ্রম আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়। আইনে ৬০ কর্মদিবসের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তির কথা বলা হলেও দেখা যায় মামলার প্রথম তারিখই পড়ে ৬০ দিন পর।

উল্লেখ্য, শ্রম আদালতগুলোতে জেলা জজ বা অতিরিক্ত জেলা জজদের বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। আর আপীল ট্রাইব্যুনালে উচ্চ আদালতের বর্তমান বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। অনেক সময় এসব আদালতে বিচারক পদ শূন্য থাকে–ফলে মামলার জট বেড়ে যায়। যেমন, ২০১৭ সালের মার্চে আপীল ট্রাইব্যুনালে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মো. আবদুল হাইকে নিয়োগ দেয়ার পূর্বে এই পদটি প্রায় আট মাস শূন্য ছিল। এসময় আপীল ট্রাইব্যুনালে প্রায় ৭১৯টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল।

শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও ৭টি শ্রম আদালতের অবস্থানঃ

ক্র/নং	আদালতের নাম	অবস্থান
১	শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল	৪৩ আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা
২	১ম শ্রম আদালত, ঢাকা	শ্রম ভবন, ৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা
৩	২য় শ্রম আদালত, ঢাকা	শ্রম ভবন, ৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা
৪	৩য় শ্রম আদালত, ঢাকা	শ্রম ভবন, ৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা
৫	১ম শ্রম আদালত, চট্টগ্রাম	৮ কাতালগঞ্জ, চকবাজার, চট্টগ্রাম
৬	২য় শ্রম আদালত, চট্টগ্রাম	৮ কাতালগঞ্জ, চকবাজার, চট্টগ্রাম
৭	বিভাগীয় শ্রম আদালত, রাজশাহী	শ্রম ভবন, গ্রেটার রোড, রাজশাহী
৮	বিভাগীয় শ্রম আদালত, খুলনা	১৪, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা

২৭ হাজার কারখানার জন্য তিন শত পরিদর্শক!

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর বিধান অনুযায়ী শ্রমিকদের কল্যাণ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়ন তদারকির দায়িত্ব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়াধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের।

১৯৭০ সনে কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর নামে এই স্বতন্ত্র পরিদপ্তর সৃষ্টি হয়। পরে এটি অধিদপ্তরে উন্নীত হয়। মুলত কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ক্রমবর্ধমান বিপুল শ্রমজীবী মানুষের আইনগত অধিকার, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করে আসছে। গার্মেন্টস কারখানায় কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও এ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই প্রতিষ্ঠানের জনবল ও অবকাঠামো সারা দেশের কারখানা এবং দোকান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অপ্রতুল। তবে একে অধিদপ্তরে উন্নীত করার পর এর জনবল কিছুটা বেড়েছে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬ থেকে দেখা যায়, দেশে ঐসময় পর্যন্ত নিবন্ধিত কারখানার সংখ্যা ছিল ২৬ হাজার ৯৫৩। বলা হচ্ছে, বর্তমানে ২৩টি উপ-মহাপরিদর্শক কার্যালয়ের মাধ্যমে পরিদর্শন চালানো হয় এবং বছরে প্রায় ৩০ হাজার পরিদর্শন কার্যক্রম চলে। ২০১৭ সালের শুরুতে এসব পরিদর্শন কার্যালয়ে ২৬৪ জন পরিদর্শক ছিলেন এবং আরও প্রায় ৮৯ জন পরিদর্শক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছিল। বলা বাহুল্য, এইরূপ নিয়োগের পরও কারখানার তুলনায় পরিদর্শকের অপ্রতুলতা থেকেই যাবে। ফলে দেশে শত শত প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনের বাইরে এবং একই সঙ্গে পরিদর্শনের বাইরে থেকে যাওয়ার শঙ্কা আছে।

এদিকে গত কয়েক বছরে গার্মেন্টস খাত নিরাপদ করার জন্য সেখানে পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার করা হলেও অন্যখাতগুলোতে পরিদর্শন সেরূপ নয়। পরিদর্শন বিভাগের কার্যক্রমের অর্ধেকই কেন্দ্রীভূত থাকছে গার্মেন্টস খাতকে ঘিরে। মূলত বৈদেশিক ক্রেতাদের চাপে পড়ে সরকার সেদিকে বেশি নজর দিয়েছে। অন্য খাতগুলো নিয়ে প্রচার মাধ্যমের স্পর্শকাতরতা কম– সেজন্য সেসব খাতের শ্রমিকদের নিরাপত্তার দিকে নজরও কম।

এদিকে ২০১৭-এর ১ মার্চ দৈনিক সমকালে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে* দেখা যায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের (ডিআইএফই) সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী, গার্মেন্টস খাতের অসংগঠিত কারখানাগুলোর মধ্যে ৩০ শতাংশ ভবনের কাঠামোতে বড় ধরনের দুর্বলতা নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ৩৫ শতাংশ কারখানার অগ্নি প্রতিরোধ এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থায় দুর্বলতা আছে। বৈদ্যুতিক নিরাপত্তায় ত্রুটি আছে ১৩ শতাংশ কারখানায়। ১০ শতাংশ কারখানায় সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি কাঠামো অনুসরণ করা হয় না। একই সংখ্যক কারখানার শ্রমিকরা নিয়মিত মজুরি পান না। ২০১৬ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে পরিদর্শন করে এ প্রতিবেদন তৈরি করেছে ডিআইএফই। প্রতিবেদন অনুযায়ী, এসব কারখানার মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন নেই ৯৭ শতাংশের। পার্টিসিপেটরি কমিটি নেই ৬৫ শতাংশ কারখানায়। ৯ শতাংশ কারখানায় শ্রমিকরা কাজ করেও ওভারটাইম পান না। ২১ শতাংশ কারখানায় ছুটির বিধান অনুসরণ করা হয় না। এমনকি মাতৃত্বকালীন ছুটি দেওয়া হয় না ৩৫ শতাংশ কারখানায়।

*'সংগঠনবহির্ভূত কারখানায় নিরাপত্তা ত্রুটি বেশি', দৈনিক সমকাল, ১ মার্চ ২০১৭

৭ শ্রমজীবীদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা চিত্র ২০১৭

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দিবস পালিত হয়। এটা বিশ্বজনীন স্বীকৃতি সত্য যে, শিল্পে কর্মরত শ্রমিকের স্বাস্থ্য ভালো এবং নিরাপদ থাকলেই কেবল তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে–কিন্তু এ বিষয়ে বাংলাদেশে সচেতনতা কম। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যয় যে কোনো খরচ নয়, বিনিয়োগ– এই উপলব্দি বাংলাদেশে শিল্প পরিমন্ডলে আজো গড়ে ওঠেনি। ফলে শ্রমিকরা এখানে কর্মক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রের বাইরে– উভয়স্থানেই দুর্দশাগ্রস্ত। সর্বশেষ ২০১৭ সালের প্রথম এগারো মাসে কর্মক্ষেত্রে ৩০৫টি দুর্ঘটনায় শ্রমিক মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৪০৫। সবচেয়ে বেশি শ্রমজীবী মারা গেছে নির্মাণ খাতে ১৩৭ জন। ২০১৬ সালে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৩৮২।

উল্লেখ্য, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে গৃহীত জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০-এ পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে বিশেষ জোর দেয়া হয়। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়নের ৮ নম্বর লক্ষ্যমাত্রায় টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সবার জন্য উৎপাদনশীল পেশা এবং সম্মানজনক কাজের ওপর জোর দেয়া হয়।

বাংলাদেশে বর্তমানে স্থায়ী-অস্থায়ী ও ছোট-বড় মিলে প্রায় ৮০ লাখের মতো বিভিন্ন ধরনের 'প্রতিষ্ঠান' রয়েছে। তবে সব প্রতিষ্ঠান শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের (ডিআইএফই) নজরদারিতে নেই। যেসব প্রতিষ্ঠানে ডিআইএফইর নজরদারি নেই, সেখানকার শ্রমিকেরা অনেক সময় ঝুঁকির মধ্যেই পেশাগত দায়িত্ব পালন করছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। তবে সব প্রতিষ্ঠানকে নজরদারির অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে ডিআইএফই।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, বাড়তি পরিদর্শকের জন্য ২০১৭ সালে প্রায় ২ হাজার নতুন লোকবল নিয়োগের চেষ্টা অব্যাহত ছিল। এ ছাড়া সংস্থার নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রমকেও আধুনিকায়ন করা হয়েছে। ডিজিটালাইজড করা হচ্ছে সব কার্যক্রম। তবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কারখানায় নিরাপত্তা প্রশ্ন যতটা গুরুত্ব পাচ্ছে ততটা পাচ্ছে না পেশাগত স্বাস্থ্য। সাধারণভাবে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দুটি আন্তঃসম্পর্কিত হলেও আলাদা বিষয়।

রানা প্লাজা ধসের পরে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশেও পেশাগত নিরাপত্তা নিয়ে কাজ বেড়েছে–শ্রমিক নিরাপত্তা বিষয়ে একগুচ্ছ ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে– কিন্তু পেশাগত স্বাস্থ্যের বিষয়টি পূর্বের মতোই অবহেলিতই থাকছে।

কর্মস্থলে মৃত্যু: প্রচারমাধ্যম সূত্রে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান	
২০১৭ (প্রথম ১১ মাসে)	৪০৫
২০১৬	৩৮২
২০১৫	৩৭৩
২০১৪	৩২০
২০১৩	৩৭৬+১১৩৪

বর্তমানে অনুমোদিত কারখানা ভবনের নকশার সঙ্গে কারখানার যন্ত্রপাতি স্থাপনের নকশার কাঠামোগত কোনো পরিবর্তন অনুমোদিত নয়। কাজ চলার সময় ফ্যাক্টরির বাইরে যাওয়ার কোনো দরজা বন্ধ রাখাও অবৈধ। কমপক্ষে ১০০ জন শ্রমিক কাজ করা প্রতিষ্ঠানে বীমা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নিয়ম রয়েছে, কর্মী মারা গেলে মালিক বীমা দাবি আদায় করে তা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্তদের পোষ্যদের দেবেন বা শ্রম আদালতে পাঠাবেন। একজন শ্রমিকের চাকুরি নয় মাস হলেই ওই প্রতিষ্ঠানের সুবিধাভোগী বিবেচিত হবেন তিনি। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে শ্রমিকদের জন্য গ্রুপবীমা থাকবে। যেসব প্রতিষ্ঠানে পাঁচ হাজার বা বেশি শ্রমিক কাজ করেন, সেখানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকতে হবে। পেশাগত রোগে আক্রান্ত শ্রমিকদের সুস্থ হওয়া পর্যন্ত চিকিৎসার দায়িত্ব মালিককে নিতে হবে। তবে উপরোক্ত পদক্ষেপগুলোর বাস্তবায়ন শিল্প-মালিকের ইচ্ছানির্ভর থাকে বলে বাস্তবে অগ্রগতি আশানুরূপ নয়।

২০১৭ সালে চামড়া খাতের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে– কারখানাগুলো যখন ঢাকার হাজারীবাগে ছিল, তখনো বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। যা দশকের পর দশক শ্রমিক স্বাস্থ্যের জন্য চরম ক্ষতিকর ছিল। অথচ এই শিল্পের কারণে নদী দূষণে সবাই ছিল উদ্বিগ্ন

এবং নদীকে দূষণ থেকে বাঁচাতে ২০১৭ সালে যখন এই শিল্প সাভারে নেওয়া হয়, তখনও কারখানার মালিক, সরকার ও কারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর কেউ এমন কোনো উদ্যোগ নেয়নি যাতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত হয়। সাভারেও দেখা গেছে, শ্রমিকদের জন্য পানির ব্যবস্থা বা অন্যান্য জরুরি স্বাস্থ্য সুবিধার ব্যবস্থা অতি নগণ্য। প্রায় বিরান ভূমিতে গড়ে তোলা হয়েছে কারখানাপল্লী। শ্রমিকেরা কোথায় থাকবে, তাদের পরিবারের বসতি কোথায় হবে– এসব নিয়ে কেউ ভাবেননি।

অন্যদিকে, ২০১৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর টঙ্গীতে টাম্পাকো প্যাকেজিং কারখানায় গ্যাস বিস্ফোরণের পর দেশের সব কারখানায় দাহ্য পদার্থের নিরাপদ ব্যবহারসহ ভবনের কাঠামো, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিয়ে আবারও গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। ওই দুর্ঘটনায় ২৪ শ্রমিক দগ্ধ হয়ে মারা যান। গুরুতর আহত হন অন্তত ৩০ শ্রমিক।

২০১৭ সালের ২৭ মে দৈনিক বণিক বার্তায় বাংলাদেশের শিল্প পরিবেশ বিষয়ক এক লেখায় বলা হয়েছে[১৮], ২০১৩ সালের রানা প্লাজা ধসের পর বাংলাদেশের শিল্পে কর্মপরিবেশ এবং নিরাপত্তার বিষয়টি আন্তর্জাতিকভাবে সমালোচিত হয় এবং দেশ শ্রমিকদের নিরাপত্তা উন্নয়নের বিষয়ে বাধ্যবাধকতার সম্মুখীন হয়। ধারাবাহিকভাবে পোশাক কারখানায় কর্মপরিবেশ ও নিরাপত্তার জন্য গড়ে ওঠে তিনটি প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো– জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কর্মপরিকল্পনা (এনটিপিটি)– যা বাংলাদেশ সরকার কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীন, ইউরোপীয় ক্রেতাদের অ্যাকর্ড এবং উত্তর আমেরিকার ক্রেতাদের 'অ্যালায়েন্স'। এনটিএপি, 'অ্যাকর্ড' ও অ্যালায়েন্স মূলত পোশাক কারখানায় আগুন, বিদ্যুত ও ভবনের কাঠামোগত ত্রুটি চিহ্নিত করা এবং সংস্কার বিষয়ে তদারকি করছে। পৃথকভাবে তিনটি সংস্থা তাদের অধীন কারখানাগুলোর কাঠামোগত ও অগ্নিনিরাপত্তার বিষয়ে পরিদর্শন চালাচ্ছে। উল্লিখিত তিনটি প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত পোশাক কারখানাগুলো অগ্নি ও ভবনের কাঠামোগত নিরাপত্তা উন্নয়নে কমবেশি অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং যেসব কারখানা অতিরিক্ত ঝুঁকিপূর্ণ, তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। যদিও অনেক কারখানা এখনও পরিদর্শনের আওতায় আসেনি, তবে জানা যায়, তৈরি পোশাকসহ সব ধরনের কারখানার নিরাপত্তা মান ও সংখ্যা যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। পোশাক কারখানার মতো অন্যান্য শিল্প কারখানাকেও নিরাপদ করতে নতুন করে পরিদর্শনের এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কার্যকর পরিদর্শন কৌশল নির্ধারণে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর সহযোগিতা নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশে গার্মেন্টস খাত শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যতটা ফোকাস পাচ্ছে অন্যান্য অনেক খাত সেভাবে পাচ্ছে না। যার মধ্যে একটি হলো জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প।

বাংলাদেশে শ্রমিকদের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এক ক্ষেত্র হলো শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডগুলো। সরকারি হিসাবে এইরূপ ইয়ার্ডের সংখ্যা ৬০টি হলেও বাস্তবে সংখ্যা আরও বেশি। অন্যদিকে পরিবেশ অধিদপ্তর যদিও বছরে ৭-৮টি জাহাজ কাটার অনুমতি দেয়– কিন্তু কার্যত কাটা হয় আরো অধিক। বাংলাদেশে স্থানীয় বাজারে রড ও ইস্পাতের চাহিদা মেটায় এই শিল্প। এই ব্যবসার আকার প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা। ফলে এই খাতের ব্যবসায়ীদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাবও অনেক বেশি।

'স্ক্র্যাপ' জাহাজের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হলো বিপজ্জনক বা তেজস্ক্রিয় বর্জ্য। জাহাজে অ্যাসবেস্টস, লুব্রিকেন্ট ওয়েলসহ নানা ধরনের মারাত্মক ক্ষতিকর বর্জ্য থাকে– তাই 'বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজ ভাঙা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১১'-এর ১৯ (১) বিধি অনুযায়ী, পরিবেশগত ছাড়পত্র নেওয়ার বিধান থাকলেও এই ছাড়পত্র নেওয়ার ঘটনা বিরল। ২০১৬ সালের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, দু'শরও বেশি জাহাজ কাটা হলেও ছাড়পত্র নেয়া হয়েছে মাত্র আটটির। চট্টগ্রাম বিভাগীয় পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শক হারুন অর রশীদ খান বলেন, এখন শিল্প মন্ত্রণালয়ও এ বিষয়ে অনুমোদন দেয়। ফলে মালিকরা সেখানকার অনুমোদন নিয়েই জাহাজ কাটা শুরু করে। পরিবেশের ছাড়পত্রের তোয়াক্কা করে না।[১৯]

উপরোক্ত বাস্তবতাতেই ২০১৬ সালে এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, বাংলাদেশের মানুষদের গড় আয়ু ৭০ বছর হলেও জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের শ্রমিকদের আয়ু ৪০ বছরে এসে দাঁড়িয়েছে। নরওয়েভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল ল' অ্যান্ড পলিসি ইনস্টিটিউটের (আইএলপিআই) প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে আসে। এই খাতের শ্রমিকরা এখনো গ্রুপ ইন্সুরেন্সের সুবিধা থেকেও বঞ্চিত। অথচ শ্রমআইন অনুযায়ী এক শ' জনের বেশি কর্মী থাকলেই সেখানে গ্রুপ ইন্সুরেন্স বাধ্যতামূলক। অধিকাংশ ইয়ার্ডে ৩-৪ শত করে শ্রমিক কাজ করে।

[১৮] ড. মো. ইদ্রিস আলম, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা।

[১৯] http://www.dw.com/bn (*জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প: আজও নেই শ্রমিকের জীবনের দাম*, ১৮ এপ্রিল ২০১৭)

বয়লার বিস্ফোরণঃ থামছে না

২০১৭ সালে বার বার বয়লার বিস্ফোরণ ছিল বাংলাদেশের শ্রমখাতের অন্যতম আলোচিত ঘটনা। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে এটা নিরাপত্তাহীনতার এক বড় বিষয় হয়ে উঠেছে। বছরের প্রথম ছয় মাসে দেশের বিভিন্ন স্থানে বয়লার বিস্ফোরণে মারা গেছে ২৮ জন। এছাড়া 'সেইফটি এন্ড রাইটসে'র অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ২০১২ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত অন্তত ৩৩টি স্থানে বয়লার বিস্ফোরণের খবর প্রকাশিত হয়েছে প্রচারমাধ্যমে। যাতে ৪১ ব্যক্তি তাৎক্ষণিকভাবে নিহত হয়েছিল। ২০১২ পরবর্তী সময়ে দেখা গেছে প্রতি বছরই গড়ে ৫ থেকে ৯টি করে এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটছে।

গত সাড়ে ছয় বছরের মধ্যে সবচেয়ে মর্মান্তিক বয়লার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে ২০১৭ সালের ১৯ এপ্রিল। দিনাজপুর সদর উপজেলার রানীগঞ্জে যমুনা অটোমেটিক রাইস মিলের বয়লার বিস্ফোরিত হয়ে ২৮ জন দগ্ধ হন। এ ঘটনায় মৃত্যু হয় ১৮ শ্রমিকের। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বয়লার বিস্ফোরণে কোনো একক ঘটনায় নিহতের এ সংখ্যাই সর্বোচ্চ।

দিনাজপুরের বয়লার বিস্ফোরণের পর ২৪ এপ্রিল কোতোয়ালি থানায় যমুনা অটোমেটিক রাইস মিলের মালিক সুবল ঘোষসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন নিহত এক শ্রমিকের স্ত্রী। দিনাজপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) মো. ফখরুল ইসলাম বলেন, ২ জুলাই দিনাজপুরের মুখ্য বিচারিক হাকিমের আদালত থেকে এই তিনজন জামিন পেয়ে গেছেন।

এরপর ৩ জুলাই সোমবার গাজীপুরের কাশিমপুরের নয়াপাড়া এলাকার মালটিফ্যাবস লি. নামের পোশাক কারখানার বয়লারে ভয়াবহ বিস্ফোরণে ১৩ জন শ্রমিক নিহত হন। আহত হন অর্ধশতাধিক শ্রমিক ও পথচারী। এ দুর্ঘটনায় সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা হিসেবে ছাড়পত্র ছাড়া বয়লার চালানোর দায়ে মালটিফ্যাবস কর্তৃপক্ষকে জরিমানা করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়। জরিমানার পরিমাণ ২০ হাজার টাকা।

বয়লার বিস্ফোরণের একের পর এক ঘটনা ঘটলেও এসব ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিচার হওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল। আবার কারখানার বয়লারগুলো নিয়মিত দেখভালের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় নামে একটি আলাদা কার্যালয় আছে। কিন্তু দেশব্যাপী তাদের নিয়মিত পর্যবেক্ষণের ঘাটতি রয়েছে। তবে ঐ কার্যালয় সূত্র বলেছে, সাড়ে পাঁচ হাজার বয়লার পরিদর্শনের জন্য মাত্র পাঁচজন পরিদর্শক আছেন। এই অপ্রতুলতা নিয়মিত পর্যবেক্ষণের কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

সরকারি বয়লার পরিদর্শক মো. শরাফত আলী জানান, তৈরি পোশাকশিল্প, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, কেমিক্যাল কোম্পানি, চালকল ও ট্যানারি শিল্পে বয়লার ব্যবহার হয়ে থাকে বেশি। পোশাকশিল্পে ইস্ত্রি বা শুকানোর কাজে এবং অন্যান্য শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্য শুকানোর কাজেই সাধারণত বয়লার ব্যবহার হয়। তিনি জানান, ২২ দশমিক ৭৬ লিটারের বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন যেকোনো বয়লার হলেই তা নিবন্ধন করতে হয়। কেবল সেই হিসাবেই দেশে বয়লার আছে সাড়ে পাঁচ হাজার। এর মধ্যে পোশাক কারখানাগুলোতেই রয়েছে তিন হাজার বয়লার।

অনুমোদনের চেয়ে বেশি মাত্রার চাপে বয়লার পরিচালনাকেই বয়লার বিস্ফোরণের কারণ হিসেবে প্রচার মাধ্যমের কাছে তুলে ধরেন প্রধান বয়লার পরিদর্শক মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান।

এদিকে বাংলাদেশ এখনও কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (আইএলও)'র ১২টি কনভেনশন সই করেনি। শ্রমিক স্বার্থ সংক্রান্ত আইএলও'র ৩৩টি কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ এবং তা বাস্তবায়নে কাজও করছে। কিন্তু স্বাক্ষর করেনি কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ১২টি কনভেনশনের একটিতেও। যার মধ্যে রয়েছে– অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ কনভেনশন, ১৯৮১; অকুপেশনাল হেলথ সার্ভিস কনভেনশন, ১৯৮৫; প্রমোশনাল ফ্রেমওয়ার্ক ফর অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ কনভেনশন, ২০০৬; হাইজিন (কমার্স অ্যান্ড অফিসেস) কনভেনশন, ১৯৬৪; অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ কনভেনশন, ১৯৭৯; সেফটি অ্যান্ড হেলথ ইন কনস্ট্রাকশন কনভেনশন, ১৯৮৮; সেফটি অ্যান্ড হেলথ ইন অ্যাগ্রিকালচার কনভেনশন, ২০০১; রেডিয়েশন প্রোটেকশন কনভেনশন, ১৯৬০; অকুপেশনাল ক্যানসার কনভেনশন, ১৯৭৪; ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট (এয়ার পলুশন, নয়েজ অ্যান্ড ভাইব্রেশন) কনভেনশন, ১৯৭৭; অ্যাসবেসটস কনভেনশন, ১৯৮৬; কেমিক্যাল কনভেনশন, ১৯৯০।

কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় এগিয়ে পরিবহন খাত:
শ্রমিকদের নেই প্রয়োজনীয় বিশ্রাম

২০১৬ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় প্রথম স্থান ছিল পরিবহন খাতের। এর পরই নির্মাণ খাত। প্রায় অনুরূপ প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে ২০১৭ সালেও। দৈনিক প্রথম আলো এ বছর তাদের এক প্রতিবেদনে* বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-এর এক অনুসন্ধানের ফলাফল তুলে ধরে লিখেছে, ২০১৬ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় বাংলাদেশে মোট ৬৯৯ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে ২৪৯ জনই পরিবহন খাতের শ্রমিক। আর নির্মাণ খাতে ৮৫ জন এবং পোশাক খাতে মারা গেছেন নয়জন। অন্যদিকে, ২০১৭ সালের প্রথম ছয় মাসে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক মৃত্যুর পরিসংখ্যানে পরিবহন খাতের অবস্থান ছিল তৃতীয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কর্মঘণ্টাসহ এই খাতের শ্রমিকদের অধিকারগুলো মানা হয় না বলে যানবাহনের চালকেরা অবসাদগ্রস্ত থাকেন। এ কারণে পরিবহনযন্ত্রগুলো অধিক দুর্ঘটনার শিকার হন। তবে যাত্রী ও সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা মনে করেন, দেশের সড়কগুলো ভয়াবহ মৃত্যুফাঁদ হয়ে আছে চালকদের বেপরোয়া মনোভাবের কারণে। বিশ্রামহীনভাবে গাড়ি চালানোকে দুর্ঘটনার একটি বড় কারণ বলে মনে করেন তাঁরা।

উপরোক্ত প্রতিবেদনে যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী'র বক্তব্য তুলে ধরে উল্লেখ করা হয়, পরিবহন খাতের শ্রমিকদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও চাকরির নিশ্চয়তা না থাকা এই পেশাকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। তিনি বলেন, শ্রমিকদের অতিরিক্ত কাজের প্রভাবে তাদের জীবন যেমন ঝুঁকিতে পড়ছে তেমনি তাদের হাতে যাত্রীরা মারা যাচ্ছে। বেশির ভাগ চালক প্রতিদিন গড়ে ১৩ ঘণ্টা বা তার বেশি গাড়ি চালান। পাশাপাশি শ্রমিক হিসেবে প্রয়োজনীয় অনেক সুযোগ-সুবিধা থেকেও তারা বঞ্চিত। সমীক্ষায় এও দেখা যাচ্ছে, পরিবহন খাতের ৮৬ শতাংশ শ্রমিক দিনে ১৩ ঘণ্টার বেশি কাজ করেন। এই খাতের ৯০ শতাংশ শ্রমিকের সাপ্তাহিক ছুটি নেই। শ্রমিকদের এইরূপ নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা না থাকা এবং পর্যাপ্ত বিশ্রামের সুযোগ না থাকার প্রভাব পড়ে তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) অ্যাকসিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক মো. মোয়াজ্জেম হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, যানবাহন চালানোর সময় মস্তিষ্ক, চোখ, কান, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকে। ফলে একটানা ৮-১০ ঘণ্টা চালালে চালকেরা অসংলগ্ন হয়ে পড়েন।

ঢাকা-রংপুর পথে শ্যামলী পরিবহনের বাস চালান মো. নাসির। রাতে ঢাকা থেকে রওনা দিয়ে আট-নয় ঘণ্টা বাস চালিয়ে সকালে রংপুর পৌঁছান। তিন-চার ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে দুপুরের আগেই ঢাকার উদ্দেশে ফিরতি যাত্রা করেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৬ থেকে ২০ ঘণ্টাই বাস চালাতে হয় নাসিরকে। বিশ্রামের সুযোগ খুব বেশি থাকে না। একই দিনে প্রথম ট্রিপের পরবর্তী সময় অবসাদ পেয়ে বসে।

গাবতলী এলাকায় কথা হয় গাবতলী-যাত্রাবাড়ী পথের বাসচালক মো. সুজন খানের সঙ্গে। সুজন বলেন, 'সকালে ছয়টায় ফার্স্ট ট্রিপ শুরু করি। রাত ১২টায় লাস্ট ট্রিপ। দুপুরে ২০-৩০ মিনিট খাওয়া ছাড়া টানা চালাই। ড্রাইভারের সিটটা আগুনের মতো গরম থাকে। স্টিয়ারিং ধইরা বইসা থাকতে থাকতে একসময় শরীর চলতে চায় না। সারা দিন চিল্লাচিল্লি আর হর্ণের আওয়াজে খুব কষ্ট হয়।' কথা বলতে বলতে দরদর করে ঘামছিলেন সুজন।

বাংলাদেশ শ্রমআইন ২০০৬ অনুযায়ী, প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক দৈনিক আট ঘণ্টার বেশি সময় কাজ করতে পারবেন না বা তাকে দিয়ে কাজ করানো যাবে না। ক্ষেত্রবিশেষে ১০ ঘণ্টা পর্যন্ত শ্রমিক কাজ করতে পারবেন। বাস্তবে পরিবহন শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এই কর্মঘণ্টার হিসাব মানা হচ্ছে না।

প্রথম আলোর উক্ত প্রতিবেদনে প্রতিবেদক আনুমানিক এক হিসাব তুলে ধরে দেখান, দূর পাল্লার গণপরিবহনে প্রায় ১ লাখ ৮৪ হাজার শ্রমিক কাজ করেন। এই শ্রমিকদের সবাই দৈনিক আট ঘণ্টার বেশি কাজ করেন এবং প্রায় ৫০ শতাংশ দৈনিক ১৫ ঘণ্টার বেশি কাজ করেন। ২০ শতাংশ শ্রমিক কোনো ধরনের নিয়মিত কর্মবিরতি ছাড়াই কাজ করেন।

এ বিষয়ে শ্যামলী পরিবহনের স্বত্বাধিকারী ও বাংলাদেশ বাস-ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি রমেশ চন্দ্র ঘোষ বলেন, কোনো চালক ২৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত দূরত্বে গেলে ৩-৪ ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে ফেরত আসেন। দূরপাল্লার চেয়ে রাজধানীর ভেতরে চলাচলকারী বাসশ্রমিকদের টানা বেশি কাজ করতে হয়।

অন্তত ১০ জন পরিবহন শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, দিনে ১৬ থেকে ১৮ ঘণ্টা কাজ করলেও তাঁদের মজুরি নির্ধারিত নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ করেন পরিবহন খাতের শ্রমিকেরা। কোনো ধরনের নিয়োগপত্র দেওয়া হয় না। মালিকেরা চাইলে যেকোনো সময় কাজ থেকে বাদ দিতে পারেন। অসুস্থ হলে কিংবা ছুটি নিলে ওই দিনে কোনো আয় থাকে না।

[তথ্যসূত্র: প্রথম আলো, ১ মে ২০১৭]

*সামছুর রহমান, সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কর্মক্ষেত্র পরিবহন খাত, ১ মে ২০১৭

৮

নারী শ্রমিক

যাতায়াতে নিরাপত্তা সংকট ও মজুরি বৈষম্য

বাংলাদেশে নারী শ্রমিকদের বড় অংশ গৃহশ্রমিক এবং কৃষি কাজে যুক্ত। তবে নারী শ্রমিকদের সংখ্যা বিশেষ দ্রুততায় বাড়ছে শিল্পখাতে। ইতোমধ্যে শ্রমখাতে নারী শ্রমিকরা প্রায় এক চতুর্থাংশে পরিণত হয়েছেন।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ শ্রমজরিপ অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে কৃষিকাজে নিয়োজিত রয়েছে আড়াই কোটি শ্রমিক। এর মধ্যে প্রায় ১ কোটি ৫ লাখ নারী। এক দশক আগে তা ছিল ৩৮ লাখ। যেখানে কৃষি খাতে পুরুষ শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ সাড়ে ৩ শতাংশ কমেছে, সেখানে নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণ বাড়ছে প্রায় ১৭ শতাংশ হারে।

অন্যদিকে তৈরি পোশাক খাতে বর্তমানে কর্মরত আছে প্রায় ৪৪ লাখ শ্রমিক, যার ৮০ শতাংশ বা প্রায় ৩৫ লাখ নারী। খাতটির নারী শ্রমিকের ওপর নির্ভর করেই ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০ বিলিয়ন ডলার রফতানির স্বপ্ন দেখছেন খাতসংশ্লিষ্টরা।

এই বিপুলসংখ্যক নারী শ্রমিক যেমন বৈষম্যের শিকার, তেমনি রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও অনেক ক্ষেত্রেই যথাযথ স্বীকৃতি পান না তারা। অভিযোগ রয়েছে, বিভিন্ন খাতে নারী শ্রমিকরা পুরুষ শ্রমিকের চেয়ে মজুরিও কম পান। এরকম অবস্থাতেই নারীদের কর্মসংস্থানে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে এখন বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। সম্প্রতি অর্থ সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান মাস্টার কার্ড এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের নারী শ্রমজীবীদের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে তাদের অনুসন্ধান তুলে ধরেছে। সক্ষমতা, কর্মসংস্থান, নেতৃত্ব এ তিন ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অনুপাতের ওপর জরিপ চালিয়ে 'মাস্টার কার্ড ইনডেক্স অব উইমেনস অ্যাডভান্সমেন্ট (এমআইডব্লিউএ) ২০১৫' শীর্ষক প্রতিবেদনটি তৈরি করে উক্ত সংস্থা। এক্ষেত্রে প্রতি ১০০ পুরুষের বিপরীতে নারীর অনুপাত কত তার ভিত্তিতে স্কোর নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, নারীর কর্মসংস্থানে দক্ষিণ এশিয়ার পাঁচটি দেশের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে নেপাল। দ্বিতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ। এর পরই রয়েছে ভারত, শ্রী লংকা ও পাকিস্তান।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নারীর কর্মসংস্থানে দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে সফল নেপাল। দেশটির স্কোর ৯৬। কারণ সাম্প্রতিক কর্মসংস্থানে নিয়মিত হওয়া নারীর অনুপাত ১০০ পুরুষের বিপরীতে ১০০ দশমিক ১। এছাড়া শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও নেপালের নারীরা বেশ ভালো অবস্থানে রয়েছেন। বর্তমানে এ অনুপাত ১০০ পুরুষের বিপরীতে ৯২ দশমিক ২। অপরদিকে কর্মসংস্থানে নিয়মিত হওয়া ও শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণে বাংলাদেশে নারীদের স্কোর ১০০ পুরুষের বিপরীতে ৮৩ দশমিক ৩। এছাড়া ভারতের স্কোর ৫৯ দশমিক ৮, শ্রী লংকার ৪৬ দশমিক ২ ও পাকিস্তানের ৪১ দশমিক ৪।

অন্যদিকে, 'গ্রামীণ জীবনযাত্রায় স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য প্রচারাভিযানে'র (সিএমআরএল) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের শ্রমবাজারে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ থাকলেও ৭২ শতাংশই হলো অবৈতনিক পারিবারিক শ্রমিক। ৭৭ শতাংশ গ্রামীণ নারী কৃষিসংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত থাকলেও তাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো স্বীকৃতি নেই। ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত নারী শ্রমিকদের নিয়ে খুব একটা সোচ্চার হতে দেখা যায়নি কোন রাজনৈতিক দলকে। তবে এর মাঝেই পোশাক শিল্পে কর্মরত নারীরা তাদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

কৃষিকাজে নিয়োজিত নারী-পুরুষ শ্রমিকদের সক্রিয় কোনো সংগঠনও নেই। এক সময় বিভিন্ন বামপন্থী রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন হিসেবে ক্ষেতমজুর সংগঠন জোরদার ছিল। সেইসব সংগঠন এখনও আছে, তবে সংগঠিত নয়। কৃষক সংগঠনগুলোও সংগঠিত নয়। কাজেই বেতন বা মজুরি বৃদ্ধির দাবি বা সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা বা মৌসুমভিত্তিক কর্মহীনতা ইত্যাদি সমস্যার সমাধানে সরকারি অনুকম্পাই এখন একমাত্র বিবেচনা ও ভরসা।

চাতাল, পোশাক শিল্প, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি খাতের নারী শ্রমিকরা জানান, কর্মক্ষেত্রে মজুরির বৈষম্য জেনেও জীবিকার তাগিদে তারা কাজ করে যাচ্ছেন। পুরুষ শ্রমিকের সঙ্গে সমান তালে কাজ করলেও কখনও কখনও পুরুষ সহকর্মী কিংবা ঠিকাদারের হাতে নিগৃহীত হতে হয় তাদের। এমনকি অনেক সময় নারী বলে কাজে নিতেও আপত্তি জানান ঠিকাদাররা। কাজের ধরন ও সময় অনুসারে মজুরি নির্ধারণ করা হলেও নারীরা প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষ শ্রমিকের অর্ধেক কিংবা তার চেয়েও কম মজুরি পান। পুরুষ শ্রমিক দৈনিক ৩০০-৬০০ টাকা মজুরি পেলেও নারী শ্রমিককে দেওয়া হয় ১৬০ থেকে ৩৫০ টাকা। শুধু কর্মক্ষেত্রে নয়, অনেক ক্ষেত্রে ঘরেও নিগৃহীত হন তারা।

তবে নারী শ্রমিকদের একটি বড় সমস্যা যাতায়ত। পরিবহন সংকটের কারণে অনেক নারী শ্রমজীবীই স্বস্তিতে কর্মস্থলে আসা-যাওয়া করতে পারেন না। এছাড়া রয়েছে যাতায়তকালীন নিরাপত্তাহীনতা। যানবাহনে উঠতে গিয়ে প্রায়ই যৌন হয়রানিসহ নানারকম অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছেন নারীরা। শুধু তাই নয়, গণপরিবহনে নারীরা এখন ধর্ষণের শিকারও হচ্ছেন। কখনো কখনো ধর্ষণের পর হত্যাও করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে গণপরিবহন নারীদের জন্য এখন এক নতুন আতঙ্কে পরিণত হয়েছে।

সাধারণত মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীদের জন্য চলাচলে গণপরিবহনই একমাত্র ভরসা। নারী যাত্রীরা কখনো কখনো পাশের পুরুষ যাত্রী, বাসের চালক, কন্ডাক্টর আর হেলপার দ্বারা অশোভন আচরণের শিকার হচ্ছেন। ওঠানো, নামানো, জায়গা কম, ধাক্কা খাওয়া, নানা অজুহাতে নারীদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করা, অশালীন মন্তব্য করা, ইচ্ছাকৃতভাবে জটলা পাকিয়ে ধাক্কাধাক্কি করে নারীদের গায়ে পড়া–গণপরিবহনে এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয় অধিকাংশ নারীকেই। গণপরিবহনে যৌন হয়রানি প্রসঙ্গে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মজীবী নারী বলেন, 'বাসে উঠতে এবং নামতে হেলপারের হাত শরীরের পেছন থেকে শুরু করে বিভিন্ন অংশে গিয়ে লাগে। কিছু পুরুষযাত্রী ইচ্ছা করে গায়ের ওপরে পড়ে যায়। এসব ধরলে এই জীবনে কতবার যে অশোভন আচরণের শিকার হয়েছি, তা হিসাব করে বলা অসম্ভব।'

পপুলেশন সার্ভিস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, অ্যাকশনএইড ও ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্টের সম্মিলিত উদ্যোগে 'গণপরিবহনে নারীর নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াত নিশ্চিত করতে করণীয়' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় জানা যায়, বর্তমানে রাজধানী শহরে বসবাসকারী

নারীর মধ্যে ২০.৭ শতাংশ নারী পাবলিক বাসে যাতায়াত করেন। তাদের মধ্যে ৪১ শতাংশই হয়রানির শিকার হয়ে থাকেন এবং ১৩ শতাংশ নারী যৌন হয়রানির ভয়ে পাবলিক বাস এড়িয়ে চলেন।

এদিকে থমসন রয়টার্স ফাউন্ডেশনের ২০১৭ সালে অক্টোবরে প্রকাশিত এক জরিপে দেখা গেছে[২০] নারীদের জন্য সবচেয়ে খারাপ মহানগরীর তালিকায় সপ্তম অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। এই তালিকায় তলানিতে স্থান পেয়েছে মিশরের রাজধানী কায়রো। কায়রোর পাশেই রয়েছে পাকিস্তানের করাচি, কঙ্গোর রাজধানী কিনসাসা ও ভারতের রাজধানী নয়া দিল্লি। আর সবচেয়ে নারীবান্ধব মহানগরী হয়েছে লন্ডন। এর মধ্যে শুধু যৌন হয়রানির ঝুঁকি বিবেচনায় তলানির দিক থেকে চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে ঢাকা।

নারীর মজুরি অসাম্যতা: কেসস্টাডি চাতাল কল

বাংলাদেশে যেসব সেক্টরে নারী শ্রমিকরা খুব বিপন্ন পরিস্থিতিতে কাজ করছেন তার একটি হলো চাতাল কল। চাতাল কলের সংখ্যা দেশের উত্তরাঞ্চলে বেশি হলেও কমবেশি তা রয়েছে দেশের সর্বত্র। দেশব্যাপী প্রায় তিন লাখ নারী শ্রমিক চাতালগুলোতে কাজ করছেন বলে অনুমান করা হয়। ২০১৭ সালের ২৮ জুলাই দৈনিক বণিকবার্তা তাদের এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে দেখিয়েছে, দেশের চাতাল কলগুলোতে সাধারণত নারী শ্রমিকদের মজুরি ১৫০-২০০ টাকা। অথচ একইরূপ

[২০] http://www.bbc.com/news/world-middle-east-41637383

কাজে পুরুষ শ্রমিকদের মজুরি ২৫০-৩০০ টাকা। যেমন, উত্তরাঞ্চলীয় জেলা জয়পুরহাটে চাতাল রয়েছে প্রায় ৫১০টি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এসব চাতাল শ্রমিকদের ৬০ শতাংশই নারী। মজুরি হিসেবে তারা পাচ্ছেন দৈনিক ২০০ টাকা। অথচ পুরুষ শ্রমিকরা পাচ্ছেন ২৫০ টাকা।

দেশে চালের বড় জোগানদাতা নওগাঁয় চাতাল রয়েছে ১ হাজার ১৪০টি। এর মধ্যে ৫০০টির মতো চাতাল চালু রয়েছে। এসব চাতালে পুরুষ শ্রমিকদের গড় মজুরি দৈনিক ২৮০ টাকা। এর বিপরীতে নারী শ্রমিকরা পাচ্ছেন ১৭০ টাকা। এ বিষয়ে নওগাঁর মহাদেবপুর চালকল মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. গোলাম মোস্তফা জানান, নারীরা পুরুষের মতো ধান সিদ্ধ ও ধান ভাঙার মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করেন না বলে তাদের মজুরি তুলনামূলকভাবে কম।

বগুড়া জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, জেলায় লাইসেন্স প্রাপ্ত চাতালের সংখ্যা ১ হাজার ৯৩৫। সব মিলে ছোট-বড় চাতাল রয়েছে প্রায় তিন হাজার। এ জেলায় চাতাল শ্রমিক আনুমানিক ২০ হাজার। প্রতি মণ ধান সিদ্ধ ও শুকানো বাবদ ২০ টাকা করে পান নারী ও পুরুষ শ্রমিকরা। তবে কিছু কিছু চাতালে নারীরা ২০ মণ ধান সিদ্ধ করে মজুরি পান ২০০ টাকা। ধান সিদ্ধ করার পরও তাদের পুরুষ শ্রমিকদের সহযোগিতা করতে হয়। আবার লট হিসেবে চুক্তিতে একজন নারী শ্রমিক ২০০ থেকে ৪০০ মণ পর্যন্ত ধান সিদ্ধ ও শুকানোর কাজে সহযোগিতা করে মজুরি হিসেবে পান ১৫০ টাকা ও সাত কেজি চাল। একই চুক্তিতে পুরুষ শ্রমিকরা পান লট হিসেবে ৭০০-৮০০ টাকা।

দিনাজপুর খাদ্য নিয়ন্ত্রক কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, জেলায় নিবন্ধিত চাতাল রয়েছে প্রায় ২ হাজার ২৬৪টি। এসব চাতালের শ্রমিক সংখ্যা ২৬ হাজার ৪০০। এসব শ্রমিকের ৬০ শতাংশই নারী। ধান পরিষ্কার, বয়লারে তুষ দেয়া, ধান সিদ্ধ ও শুকানোর কাজ করতে হয় নারী শ্রমিকদের। এর বিনিময়ে তারা দৈনিক ১৮০-২১০ টাকা হিসেবে মজুরি পান। অন্যদিকে পুরুষ শ্রমিক আয় করেন দৈনিক ২৫০-৩০০ টাকা।

রংপুর জেলা চালকল সমিতির তথ্য অনুযায়ী, জেলায় সক্রিয় চাতাল রয়েছে প্রায় ৪৫০টি। এসব চাতালে শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার ৬০০, যাদের অর্ধেকই নারী। এখানকার নারী শ্রমিকরা এক মৌসুমে এককালীন ৬ হাজার টাকা করে মজুরি পান।

নারী শ্রমিকের কিছু আইনগত অধিকার

১. বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ১০৯ ধারা অনুযায়ী, নারী শ্রমিককে তার বিনা অনুমতিতে কোন প্রতিষ্ঠানে রাত ১০টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কাজ করতে দেয়া যাবে না। তবে শ্রমিকের সম্মতি থাকলে বাধা নেই।

২. বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ৯৪ ধারা অনুযায়ী, ৪০ বা তার চেয়ে নারী শ্রমিক নিযুক্ত আছেন– এমন যেকোন প্রতিষ্ঠানে নারী শ্রমিকদের অনধিক ৬ বছর বয়সী সন্তানদের জন্য এক বা একাধিক শিশুকক্ষের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, যাতে প্রয়োজনে নারী শ্রমিক সন্তানকে বুকের দুধ পান করাতে পারেন।

৩. বাংলাদেশ শ্রমআইন ২০০৬-এর ৪৫ ধারা অনুযায়ী, অন্তঃসত্ত্বা শ্রমিকেরা সন্তান প্রসবের আগে ৮ সপ্তাহ এবং প্রসবের পরে ৮ সপ্তাহ, মোট ১৬ সপ্তাহ পূর্ণ মজুরিতে ছুটি পাওয়ার অধিকার রাখেন।

৪. বাংলাদেশ শ্রমআইন ২০০৬-এর ২৮৬ (১) ধারা অনুযায়ী, প্রসূতিকল্যাণ সুবিধা সংক্রান্ত বিধান লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি বা মালিক ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হবেন। এই ধরনের অর্থদন্ড আরোপ করা হলে আদালত রায় প্রদানকালে আদায়কৃত দন্ডের অর্থ সম্পূর্ণ বা আংশিক সংশ্লিষ্ট নারী শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেয়ার আদেশ দিতে পারেন।

৫. কোন কারখানায় ৬ মাস যাবত কাজ করেছেন এমন নারী শ্রমিক প্রসূতিকালীন সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। তবে কোন নারী শ্রমিক প্রসূতিকল্যাণ সুবিধা পাবেন না যদি তার সন্তান প্রসবের সময় ২ বা ততোধিক সন্তান জীবিত থাকে।

৬. সন্তান প্রসবের পূর্ববর্তী ৮ সপ্তাহ এবং সন্তান প্রসবের পরবর্তী ৮ সপ্তাহ যথেষ্ট কারণ না থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ শ্রমিকের চাকুরী অবসান করতে পারবেন না।

৭. বাংলাদেশ শ্রমআইন ২০০৬-এর ৯১ (১) (খ) ধারা অনুযায়ী, কারখানায় নারী শ্রমিকদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং তা যথাযথভাবে পর্দাঘেরা হবে।

৮. বাংলাদেশ শ্রমআইন ২০০৬-এর ৯৩ (৩) ধারা অনুযায়ী, কোন প্রতিষ্ঠানে ২৫ জনের অধিক নারী শ্রমিক নিযুক্ত থাকলে তাদের জন্য পৃথক বিশ্রামাগার থাকতে হবে।

৯. শ্রম আইন ২০০৬-এর ৩৩২ ধারা অনুযায়ী, "কোন প্রতিষ্ঠানে কোন কাজে মহিলা নিযুক্ত থাকলে তিনি যে পদমর্যাদার অধিকারী হোক না কেন, তার প্রতি উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্য কেউ এমন কোন আচরণ করতে পারবেন না যা অশ্লীল বা অভদ্রজনোচিত বা উক্ত মহিলার শালীনতা বা সমভ্রমের পরিপন্থী।"

১০. বাংলাদেশ শ্রমআইন ২০০৬-এর ৩৪৫ ধারায় সমকাজে সমমজুরী প্রদানের কথা বলা হয়েছে।

৯

দেশজুড়ে দলিত শ্রমজীবী

পরিস্থিতি অপরিবর্তিত

বিশ্বে দলিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২৬০ মিলিয়ন। এর মধ্যে ২১০ মিলিয়ন বা ৮০ শতাংশ দলিতই দক্ষিণ এশিয়ায় বসবাস করছে।

বাংলাদেশে একটি পুরানো শ্রমজীবী জনগোষ্ঠী হলেও দলিতরা এখানে স্থানীয় শ্রমঅর্থনীতি ও শ্রমিক রাজনীতির উপেক্ষিত এক ধারা। দেশে দলিত শ্রমজীবীদের সংখ্যা কত সে বিষয়ে এখনও নির্ভরযোগ্য কোন শুমারি না থাকলেও বাংলাদেশ দলিত এবং বঞ্চিত জনগোষ্ঠী অধিকার আন্দোলন (বিডিইআরএম) নামক একটি দলিতজোট থেকে দাবি করা হয় যে, বর্তমানে প্রায় ৩০-৪০ লাখ দলিত রয়েছে বাংলাদেশে– যাদের প্রধান অংশ পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে ও চা বাগানগুলোতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে।

এ বছর দলিতরা 'বৈষম্য বিলোপ আইন' তৈরির দাবিতে বিশেষ সোচ্চার ছিল। এছাড়া তারা মানবাধিকার কমিশনের আদলে জাতীয় দলিত কমিশন গঠনেরও দাবি তুলেছে। বরাবরের মতো এ বছরও দলিতরা বাজেটে তাদের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ, চাকুরির ক্ষেত্রে ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তির ক্ষেত্রে তাদের কোটা সুবিধা দেয়া, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোতে তাদের লক্ষ্য করে বরাদ্দ রাখা এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে তাদের উপর অত্যাচার নিপীড়নের প্রতিবাদ অব্যাহত রেখেছেন। এসব দাবিতে সমগ্র দেশে দলিত সংগঠনগুলো নিয়মিত মানববন্ধন, আলোচনাসভা ইত্যাদি করেছে। রাজধানীসহ অনেকগুলো জেলাতে বর্তমানে দলিতদের অধিকারভিত্তিক সংগঠন রয়েছে এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে নতুন নতুন সংগঠন গড়ে ওঠার প্রবণতা অব্যাহত ছিল। পাশাপাশি অচ্যুত সমস্যাজনিত সামাজিক বঞ্চনার ঘটনার প্রকাশও অব্যাহত ছিল প্রচারমাধ্যমে।

অচ্যুত সমস্যা রোধে আইন তৈরির উদ্যোগে ধীর গতি

যদিও বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ ইত্যাদিভিত্তিক বঞ্চনা কোনভাবেই অনুমোদিত নয়–কিন্তু দেশব্যাপী দলিতদের জীবনে এখনও অচ্যুত প্রথা এক বড় সমস্যা হয়ে আছে। তবে অতীতের চেয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে বর্তমানে অচ্যুত প্রথার বিরুদ্ধে দলিতরা নিয়মিত প্রতিবাদ করছেন। দিনাজপুরের খানসামা উপজেলায় এরূপ এক ঘটনায় এ বছর আলোড়ন তৈরি হয়েছিল। যেখানে দলিতরা স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার উৎসাহে প্রতিবাদের অংশ হিসেবে স্থানীয় হোটেল রেস্তোরায় খাওয়াদাওয়া শুরু করলে হোটেলের মালিকরা স্থায়ীভাবে ধর্মঘট ডেকে বসেন। এ বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসন প্রথমে দলিতদের পক্ষে ইতিবাচক থাকলেও পরে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সঙ্গে আপোষরফা করতে হয়। গাইবান্ধা এবং যশোরেও হোটেল রেস্তোরায় অচ্যুত অবস্থার অবসানে দলিতরা প্রশাসনের কাছে একের পর এক দাবি প্রকাশ করেছে ২০১৭ সাল জুড়ে। গাইবান্ধায় ফুলছড়ি ও বোনারপাড়ায় হোটেলে খাওয়ার অপরাধে এ বছর অন্তত দুটি স্থানে দলিতদের অপমান করা হয় এবং পুরো জেলাজুড়ে এখনও এইরূপ অচ্যুত মনোভাব প্রবলভাবে জারি আছে। ফুলছড়ির ঘটনায় স্থানীয় ইউএনওর কাছে আগস্টে অভিযোগ উত্থাপন করা হলেও তিনি কোন প্রতিকারমূলক উদ্যোগ নিয়েছেন বলে জানা যায় না।

অচ্যুত সমস্যা থেকে রেহাই পেতে দীর্ঘদিন থেকে দলিত সমাজ বৈষম্য বিলোপ আইন করার দাবিতে আন্দোলন করছে। যে আইনে 'অচ্যুত' প্রথাকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে। দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আইন কমিশন ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন উদ্যোগী হয়ে এইরূপ একটি আইনের খসড়া তৈরি করেছে। এটি সংসদে উত্থাপনের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ

করা হলেও ২০১৭ সালে তা পুনঃপর্যালোচনার জন্য আবার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে ফেরত পাঠানো হয় বলে জানিয়েছে দলিত অধিকার বিষয়ক জোট 'বিডিইআরএম'।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূসিতে বঞ্চনা

বাংলাদেশের সামাজিক নিরপত্তা কর্মসূচিগুলোতে বছরে প্রায় ৪৫ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়। যা মোট বাজেটের প্রায় ১৩ শতাংশ এবং জিডিপির প্রায় ২ শতাংশ। এসব কর্মসূচিতে প্রায় ৪০ লাখ উপকারভোগী রয়েছে। ২৩টি মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রায় ১৪৫টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি রয়েছে। এর মধ্যে বিগত বছরগুলোতে সুনির্দিষ্টভাবে 'দলিত, হরিজন ও বেদেদের জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচি' নামে কেবল একটি কর্মসূচিরই উল্লেখ দেখা যায়। অথচ অর্থনৈতিকভাবে দলিতরা আরও বেশি সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার দাবিদার। কারণ তাদের মাঝে দারিদ্র্যের প্রকোপ খুব বেশি। অন্যদিকে, দলিতদের লক্ষ্য করে গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অদলিতদের সুবিধাভোগী হিসেবে নির্বাচনেরও অভিযোগ উঠেছে ২০১৭ সালে। দলিত জোট বিডিইআরএম ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে এক আলোচনা সভায় স্থানীয় সাপ্তাহিক দ্বীপবাণী'র এক সংবাদের ভিত্তিতে দাবি করেছে, ভোলা জেলায় স্থানীয় সমাজকল্যাণ বিভাগ ৬৩ জন দলিত শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান এবং ৫৮০ জন দলিত বৃদ্ধকে ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে প্রায় ২৬ লাখ টাকা পেলেও তার এক পঞ্চমাংশ মাত্র দলিতদের মাঝে বিতরণ করা হয়। বাকি সুবিধা বিতরণ হয়েছে অদলিতদের মাঝে।

আবার দেশের অন্যত্র দেখা গেছে, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে দলিতদের জন্য বরাদ্দকৃত চাল-গম অত্যন্ত নিম্নমানের। কমলগঞ্জে ২০১৭ সালের জুলাইয়ে এইরূপ চাল-গম বিতরণের প্রতিবাদে চা শ্রমিকরা মানবন্ধন পালন করেছে। চা শ্রমিক অম্বিকা বোনার্জির সভাপতিত্বে উক্ত মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন, মোহন রবিদাস, গীতা রানী কানু, লসমী রাজভর ও সুমন কৈরী সুরত। বক্তারা বলেন, ঈদুল ফিতরের আগেই কমলগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন চা বাগানে যেসব খাদ্য ও পণ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয় তা ছিল খুবই নিম্নমানের। প্রতি চা শ্রমিককে এক সাথে তিন মাসের হিসাবে ৪৫ কেজি করে চাল, ৯ কেজি ডাল, ১৫ কেজি আলু, ১৫ কেজি আটা, ছয় লিটার সয়াবিন তেল, ৬টি সাবান, ১টি শাড়ী ও ১টি করে লুঙ্গী বিতরণ করা হয়। বিতরণকৃত খাদ্যের মধ্যে চাল, ডাল, আটা ও সয়াবিন তেল ছিল নিম্নমানের। চাল ছিল পোকা ও দুর্গন্ধযুক্ত। তা ছাড়া বিতরণকৃত শাড়ি ও লুঙ্গি ছিল নিম্নমানের। খাদ্য সামগ্রী বিতরণকালে চা শ্রমিকদের অভিযোগের সত্যতা পেয়ে সাবেক চিফ হুইপ উপাধ্যক্ষ মো. আব্দুস শহীদ এমপি প্রথম দিকে নিম্নমানের খাদ্যসামগ্রী বিতরণ বন্ধ রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে অভিযোগ ওঠে আবারো নিম্নমাণের খাদ্য ও পণ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।[২১]

পরিচ্ছন্নতাকর্মীর চাকুরি

সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অতীতে দলিতরা অধিক সুযোগ পেলেও বর্তমানে এই কাজে অদলিত হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষই বেশি নিয়োগ পাচ্ছেন। ফলে ঐতিহাসিক পুরানো পেশা থেকেও দলিতরা পিছিয়ে পড়ছে। আবার চাকুরিগতভাবে কোন প্রতিষ্ঠানে না থাকলে দলিতরা সরকারি খাস জায়গাতে বসবাসের অধিকার থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন। এক অনুসন্ধানে দেখা যায়, ঢাকার দুটি সিটি কর্পোরেশনে সর্বমোট পরিচ্ছন্নতাকর্মীর সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। আর সেখানে দলিত আছে এক হাজার ৫০০ জন মাত্র। এভাবে পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের মাঝে দলিতদের হিস্যা ক্রমে কমে যাওয়ার মধ্যদিয়ে আরেকটি যে সংকট তৈরি হচ্ছে তাহলো পুরানো দলিত কলোনিগুলোতে সরকার যখন আবাসনের জন্য নতুন করে ভবন তৈরি করছে তখন তাতে চাকুরি নেই এমন দলিতরা বরাদ্দ পাচ্ছেন না। সমগ্র দেশে দলিতদের মাঝে এইরূপ উচ্ছেদ আতংক বিদ্যমান।

---

[২১] http://www.ittefaq.com.bd/print-edition/others/2017/07/03/205834.html#undefined.gbpl (৩ জুলাই ২০১৭)

দলিত শ্রমিকদের মজুরি সমস্যা

প্রায় দেড় শত বছর ধরে চা শিল্পে নিয়োজিত দলিত শ্রমিকদের মজুরি বঞ্চনা এই বছরও অব্যাহত ছিল। অনুসন্ধানে দেখা যায়, বর্তমানে 'এক নিরীখ' (এক নিরীখ = ২৩ কেজি) চা পাতা উত্তোলনের জন্য মজুরি নির্ধারিত আছে ৮৫ টাকা। এর পর প্রতি কেজির জন্য ১-২ টাকা করে দেয়া হয় বাগান ভেদে। সাধারণত ছয় মাস পাতা তোলার মৌসুম থাকে। বছরের অন্য সময় বাগানের অন্য কাজগুলোতে মজুরির হিসাব আরও অপ্রতুল। ২০১৭ সালে চালের দাম যখন ৬০ টাকা ছুঁয়েছে তখন ৮৫ টাকা মজুরির চা শ্রমিকদের সীমাহীন আর্থিক বঞ্চনায় পড়তে হয়। চা শ্রমিক নেতৃবৃন্দ তাদের দৈনিক মজুরি ন্যূনতম ১৫০ টাকা করা, রেশন হিসাবে সপ্তাহে অন্তত ৫ কেজি উন্নতমানের চাল প্রদান এবং বসতভিটা স্থায়ীভাবে বরাদ্দ দানের দাবি জানিয়েছেন।

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা অব্যবহৃত থাকা

বর্তমানে দেশের সাতটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দলিতদের জন্য কোটা রয়েছে। তবে এর মধ্যে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় দলিত কোটা হিসেবে নয়– ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর জন্য বিদ্যমান কোটার অংশ হিসেবে দলিতদের আবেদন বিবেচনা করে থাকে। কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সরাসরি দলিত ও হরিজনদের জন্য এক শতাংশ আসন সংরক্ষণ করছে। কিন্তু উপরোক্ত প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দলিতদের কোটা সুবিধায় ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে 'দলিত' হিসেবে সনদপত্র অর্জন। কারণ দেশে দলিত আছে এবং কোথায় কোথায় –এইরূপ স্বীকৃতি সম্পন্ন কোন গেজেট জারি হয়নি এখনও। ফলে জেলা প্রশাসন দলিত শিক্ষার্থীদের তাদের পরিচয়ের সনদ দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে থাকে এবং এর ফলে অনেক শিক্ষার্থী কোটা-সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হতে পারছে না।

যশোরের হোটেল রেস্তোরায় বৈষম্য বন্ধে দলিতদের স্মারকলিপি পেশ

তারিখঃ ৭.৪.২০১৭

বরাবর,
পুলিশ সুপার
যশোর।

বিষয়ঃ ঋষি সম্প্রদায়ের মানুষ খাবার হোটেল ও চায়ের দোকানে সম মর্যাদা না পেয়ে বৈষম্য স্বীকার প্রসঙ্গে।

জনাব,

যথাযথ সম্মান পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার ফুলসারা, সিংহঝুলি, কয়েরপাড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন বাজারে ঋষি সম্প্রদায়ের মানুষদের খাবার হোটেল ও চায়ের দোকানে দোকানদাররা খেতে দিচ্ছে না। তাই অত্যান্ত দুঃখের সাথে আপনার কার্যালয়ে উপস্থিত হইয়া এই মর্মে অভিযোগ করিতেছি যে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে ঋষি সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েরা অত্যান্ত উচ্চ শিক্ষায় এগিয়ে গেছে এবং এ সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে পুলিশ, দারোগা, আর্মি, বিজিবি, শিক্ষক, শিক্ষিকা, চৌকিদার, দফাদার, সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী সহ বিভিন্ন সংগঠনের সাথে এ সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েরা বর্তমান চাকুরী করছে। এদের কোন বন্ধু বান্ধব বেড়াতে আসলে লজ্জায় বাজারে নিয়ে খাবার হোটেল ও চায়ের দোকানে বসতে পারে না। যাহা মানবাধিকার লংঘন। বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক অধিকার বিষয়ক অনুচ্ছেদ ২৮ এর ২,৩ ও ৪ ধারায় বলা হয়েছে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ জন্মস্থান নির্বিশেষে সব নাগরিক সমান অধিকার পাবে। অথব চৌগাছার মাত্র ৩টি ইউনিয়নের বাজারে গোটা কয়েক মানুষের জন্য ন্যায্য অধিকার থেকে দীর্ঘদিন বঞ্চিত রয়েছেন দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠি তথা ঋষি সম্প্রদায়ের মানুষ।

অতএব, হুজুরের নিকট বিনীত আকুল আবেদন এই যে, বিষয়টি বিবেচনা পূর্বক ঋষি সম্প্রদায়ের মানুষেরা যাহাতে সম অধিকার, সম মর্যাদা নিয়ে অন্য লোকের মত খাবার হোটেল ও চায়ের দোকানে খেতে পারে তার সু-ব্যবস্থা গ্রহন করতে আপনার একান্ত মর্জি হয়।

বিনীত নিবেদক
সূর্য্য বিশ্বাস
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠি
অধিকার আন্দোলন (বিডিইআরএম)
জেলা শাখা, যশোর।
মোবাঃ ০১৭২৫-০০৬২৯৯

দলিতদের প্রতি বৈষম্য: খানসামা উপজেলায় যা হলো

দিনাজপুরের খানসামা উপজেলায় এবছর হোটেল রেস্তোরায় দলিতদের বসতে ও খেতে দেয়া নিয়ে উত্তেজনাকর এক অবস্থা তৈরি হয়। খানসামায় পাকেরহাট হোটেল মালিক সমিতি ও দলিত নেতৃবৃন্দের সাথে খানসামা উপজেলা চেয়ারম্যান সহিদুজ্জামান শাহের এ বিষয়ে মে মাসে দুই দফায় বৈঠকও করেন।

মূলত ১ মে থেকে এই উত্তেজনার সূত্রপাত। উপজেলা প্রশাসনের সমর্থনে দলিতরা হোটেলে স্বাভাবিকভাবে খাবার খেতে শুরু করলে ৮ মে দুপুর থেকে পাকেরহাট হোটেল মালিক সমিতি হোটেল ধর্মঘটের ডাক দেয়। এতে হাট বাজারে আসা সাধারণ মানুষদের চরম ভোগান্তি শুরু হয়। সমিতি এ নিয়ে রাজনীতিবিদদের দিয়ে উপজেলা প্রশাসনের উপর চাপ প্রয়োগ করে। এর ফলে উপজেলা প্রশাসন আপোষরফা করে এবং পূর্বের অবস্থা মেনে নেয়! স্থানীয় উপজেলা চেয়ারম্যান বলেছেন, তিনি পরবর্তীকালে বৃহত্তর জনসমাবেশ করে এ বিষয়ে পরিস্থিতির অগ্রগতি ঘটাবেন। কিন্তু সেই সমাবেশ আর হয়নি। দলিতদের প্রতি বঞ্চনার অবসানে খানসামা উপজেলার ইউএনও সাজেবুর রহমানের ভূমিকা প্রথম থেকেই ইতিবাচক ছিল–কিন্তু পরবর্তীকালে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সহযোগিতা না পেয়ে তিনি নিষ্ক্রিয় হয়ে যান। তবে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, সমস্যার সমাধানে এখনও আশাবাদী তিনি।

দলিত বঞ্চনা : সংখ্যাগত চিত্র

- দলিতদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সুইপার-ক্লিনার-শ্রমিক-জুতা সেলাই ইত্যাদি কাজে যুক্ত;
- ৫৯ শতাংশ দলিত উত্তরদাতা বলেছেন, বংশ ও পারিবারিক পরিচয় তাদের আয়মূলক কাজ পেতে সমস্যা করে;
- দলিত খানাগুলোতে প্রায় ২১ শতাংশ পরিবারে সদস্য সংখ্যা ৭-এর বেশি;
- ৬০ শতাংশ দলিত খানার মাসিক আয় ছয় হাজার টাকার নীচে; ১৮ শতাংশ খানার মাসিক আয় তিন হাজার টাকার নীচে;
- দলিত শিক্ষার্থীদের মাঝে ড্রপআউটে হার অত্যধিক; ৬৩ শতাংশ দলিত জানিয়েছেন, তাদের পরিবারের শিক্ষার্থীদের এক সময় স্কুলে যাওয়া বন্ধ করতে হয়েছে;
- ৫৪ শতাংশ দলিত বলেছেন, দীর্ঘদিন তারা পুরো পরিবার একটি ঘরেই থাকেন;
- ৫৪ শতাংশ দলিত উত্তরদাতা বলেছেন, তাদের বাড়ির আশেপাশে হাসপাতাল নেই;
- ২১ শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন, বংশ ও পেশাগত পরিচয় প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে;
- ৩৭ শতাংশ দলিত বলেছেন, হোটেল রেঁস্তোরায় খেতে তাদের সমস্যা হয়; ৩৮ শতাংশ বলেছেন, সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে তাদের এক সঙ্গে বসে খেতে দেয়া হয় না।
- ৯৪ শতাংশ দলিত রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক না থাকার কথা জানিয়েছেন;
- ৬৩ শতাংশ বলেছেন, পরিচয় পেলে মূলধারার জনগোষ্ঠী তাদের সঙ্গে মিশতে চান না;
- ৩২ শতাংশ দলিত বলেছেন, একই ধর্মের হলেও 'অন্য জাত' হওয়ার কারণে তাদের প্রার্থনাঘরে 'ভিন্নজাত'-এর মানুষ আসে না;
- শুধু বংশ ও পেশাগত পরিচয়ের কারণে দলিতরা নির্যাতনের মুখে পড়েন বলে মত দিয়েছেন ৩৯ শতাংশ উত্তরদাতা।
- ৬৯ শতাংশ দলিত উত্তরদাতা বলেছেন, তারা যেখানে থাকছেন সেটির মালিক তারা নন;

[তথ্যসূত্র : বাংলাদেশের দলিত সমাজ: বৈষম্য, বঞ্চনা ও অস্পৃশ্যতা– মাঠ গবেষণার ফলাফল, আলতাফ পারভেজ ও মাজহারুল ইসলাম, নাগরিক উদ্যোগ ও বিডিইআরএম, লালমাটিয়া, ঢাকা।]

১০

কৃষি শ্রমজীবীদের অসহায়ত্ব

হাওরে বাঁধ ভাঙ্গাজনিত সংকট

বৃহত্তর সিলেটের হাওর এলাকা ভৌগলিকভাবে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। শুকনো মৌসুমে হাওর এলাকায় থাকে আদিগন্ত ধানক্ষেত। আর বর্ষায় থাকে দিগন্ত বিস্তৃত পানি। এই অঞ্চলে ফসল বলতে একটিই– বোরো আবাদ। ধান শুধু এখানে চালই দেয় না, সারা বছরের জন্য গরুর খাবার হিসেবে খড় ও রান্নার জ্বালানিও দেয়। হাওরের অর্থনীতি প্রধানত ধান ও মাছকে ঘিরেই আবর্তিত। পাঁচ মাস এখানে ধান আবাদকে ঘিরে কাজ থাকে। বাকি সময় এলাকায় থাকে পানি এবং কেউ কেউ মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। তবে ২০১৭-এর বর্ষায় এই অঞ্চলে পাহাড়ি পানির ঢলে বিভিন্ন এলাকায় বাঁধ ভেঙ্গে বোরো আবাদ ডুবে যাওয়ায় কৃষি শ্রমজীবীদের জীবনে চরম বিপর্যয় নেমে এসেছে।

সংকটের যেভাবে শুরু

ভারতের মেঘালয় রাজ্য থেকে ধেয়ে আসা পাহাড়ি ঢল ও ভারিবর্ষণের কারণে সুনামগঞ্জ, সিলেট, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার– এ ছয় জেলায় বাড়তি পানিপ্রবাহ শুরু হয় ২০১৭-এর ২৮ মার্চ থেকে। জেলাগুলোর ৬২ উপজেলার ৫৪১টি ইউনিয়নের মধ্যে ৫১৮টিই এসময় প্লাবিত হয়। এইরূপ ঢল-বন্যার জন্য অতিবৃষ্টি ও জলবায়ু পরিবর্তনকে অনেকে দায়ি করলেও স্থানীয় ভুক্তভোগীরা বলছেন বাঁধ উপচে কোথাও পানি ঢোকেনি। সর্বত্র নির্মাণত্রুটির কারণে বাঁধগুলো ভেঙ্গেই পানি ঢুকেছে। তবে যেভাবেই পানি প্রবেশ করুক না কেন– পানির কারণে তলিয়ে যায় হাওর এলাকার মোট ২ লাখ ১৯ হাজার ৮৪০ হেক্টর জমির ধান। কৃষি মন্ত্রণালয় নিরূপিত মান অনুযায়ী হেক্টরপ্রতি চার টন করে এসব ধানি জমি থেকে মোট চাল উৎপাদন হওয়ার কথা ছিল কমপক্ষে ৮ লাখ ৭৯ হাজার ৩৬০ টন। আর প্রতি কেজি ৪০ টাকা হিসাবে এই চালের আর্থিক মূল্য ছিল ৩ হাজার ৫১৭ কোটি টাকা। অথচ মাত্র ২০-৩০ কোটি টাকায় সঠিকভাবে বাঁধ নির্মাণ করা হলে এই সংকট সৃষ্টি হতো না।

বন্যায় বোরো ধান তলিয়ে যাওয়াসহ নানা কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এসব জেলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পরিবার। পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী, হাওর রয়েছে এমন ছয় জেলায় মোট পরিবারের সংখ্যা ২৮ লাখ ৯৭ হাজার। এর মধ্যে ঢল-বন্যায় নানাভাবে ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে ৮ লাখ ৫০ হাজার ৮৮টি বা ২৯ দশমিক ৩ শতাংশ পরিবার। সিলেটে ২ লাখ ১২ হাজার ৫৭০ পরিবার ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে। সুনামগঞ্জে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১ লাখ ৭২ হাজার ৬১৭ পরিবার, যা জেলার মোট পরিবারের ৩৯ দশমিক ২ শতাংশ। তবে প্রচারমাধ্যমে এইরূপ অনুমান প্রকাশিত হয়েছে যে, হাওর এলাকায় ছয়টি জেলা মিলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় এক কোটি। উপরোক্ত জেলাগুলোর মধ্যে সুনামগঞ্জ প্রায় পুরোটাই হাওরময়। বন্যায় এ জেলার কৃষি শ্রমজীবীদের খাদ্যনিরাপত্তা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সংকটের ধরন

সংকটগ্রস্ত জেলাগুলোর মধ্যে সুনামগঞ্জের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, পানি বৃদ্ধির ফলে বোর ধান আবাদে সবুজ হয়ে থাকা সুনামগঞ্জের প্রায় দেড় শত হাওর ২০১৭ সালের মার্চ-এপ্রিলে একের পর এক ডুবে যায়। স্থানীয় জেলা প্রশাসনের সূত্রে জানা যায়, জেলার ১৫৪টি হাওরে এবার দুই লাখ ২৩ হাজার ৮২ হেক্টর জমিতে বোরো ধান আবাদ হয়। এর মাঝে অন্তত এক লাখ ৬৬ হাজার হেক্টরের ধান তলিয়ে গেছে। ফলে এসব এলাকায় দীর্ঘমেয়াদে চালের সংকট এবং কাজের সংকট তৈরি হয়। ঢল পরবর্তীকালে অনেক মাস ধরে চালের বদলে আটা খেয়েছেন এখানকার মানুষ। ২০১৮-এর শুরুতে আবার ধান না ওঠা পর্যন্ত তাদের এভাবে চালিয়ে যেতে হবে।

ক্ষতিগ্রস্তদের খাদ্য নিরাপত্তা ভেঙ্গে পড়ার পাশাপাশি অনেকেই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া স্বরূপ আরও কিছু সমস্যায় পড়ছেন। এসব এলাকায় অনেকেই ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে ঋণ নিয়ে ছিলেন এই

আশায় যে ধান এলে শোধ করে দেবেন। কিন্তু এবার ধান মার খাওয়ায় খেতমজুররা শেষ সম্বল বিক্রি করেও ঋণের কিস্তি শোধ করতে পারছে না। ফসলহানির প্রতিক্রিয়া হিসেবে ব্যাহত হয়েছে কৃষক ও দিনমজুরদের কর্মসংস্থানও। দৈনিক বণিক বার্তার ৫ মে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, বন্যার কারণে এ সময় সিলেট অঞ্চলের ছয় জেলার কৃষক ও দিনমজুরদের মোট কর্মদিন নষ্ট হয়েছে ২৬ কোটি ৩৮ লাখ ৮ হাজার। দৈনিক মজুরি ২০০ টাকা ধরলেও এ বাবদ কৃষক ও দিনমজুরদের মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৫ হাজার ৩০০ কোটি টাকা। এলাকায় গোখাদ্যের সংকটের কারণে এবং অভাবী মানুষরা গরু বিক্রি করে দেয়ার কারণে গরুর দামও উল্লেখ্যযোগ্যভাবে পড়ে গেছে।

কারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত

সাধারণভাবে ধান ডুবে যাওয়ায় কৃষি সংশ্লিষ্ট সকলে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ক্ষুদ্র কৃষক ও কৃষি শ্রমিকরা এতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত–কারণ সংকট সামাল দেয়ার মতো সঞ্চয় এই মানুষদের নেই। যেহেতু হাওরের অর্থনীতির মেরুদন্ড হলো বোরো আবাদ এবং তার বিরাট অংশ নষ্ট হয়ে গেছে–ফলে অত্র এলাকায় অকৃষি উন্নয়নধর্মী কাজও কমে গেছে। কৃষিশ্রমিকরা কর্মসংস্থানের সংকটে পড়েছে। প্রচারমাধ্যমে প্রকাশিত ক্ষুদ্র দোকানদারদের ভাষ্য থেকে দেখা যায়, বেচাকেনা সেখানে গড়ে ৩০ শতাংশ কমে গেছে। অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ড কমে যাওয়ার হারও অনুরূপ। এসবের কারণে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিও কমে গেছে। ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে ধরে রাখতে এনজিও পরিচালিত স্কুলগুলোতে জুলাই থেকে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু শ্রমজীবী পরিবারগুলোর শিশু-কিশোরদের জন্য আয়মূলক কাজ এত অপরিহার্য হয়ে পড়েছে যে, তারা অনেকে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।

সরকার কী করেছে

সরকারের হিসাবে কেবল সুনামগঞ্জে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিবারের সংখ্যা তিন লাখ ২৫ হাজার ৯৯০। এর মধ্যে সরকারিভাবে ঘোষণা দেয়া হয়, দেড় লাখ পরিবারকে ভিজিএফ-এর আওতায় আনা হবে। এরকম কর্মসূচিতে একটি পরিবারকে মাসে ৩০ কেজি চাল দেয়া হচ্ছে। কিন্তু বাকি পরিবারগুলো চরম অনিশ্চয়তায় পড়ে ছিল। সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসক শেখ রফিকুল ইসলাম বলেছেন[২২], ১৫ টাকা কেজির চালের ৪৫টি ওএমএস কেন্দ্র চালু আছে। কেন্দ্র দ্বিগুণ করার জন্য প্রস্তাব করেছি। ২০১৭-এর জুনে অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায়ও বলেছিলেন, হাওর এলাকার ৩ লাখ ৩৯ হাজার পরিবারকে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ চাল দেয়ার লক্ষ্যে বাজেটে ৫৭ কোটি টাকা দেয়া হবে।

[২২] সুমন আফসার, সাঈদ শাহীন, সাইফ বাপ্পী, 'হাওড়ে সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতি প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা'

অন্যদিকে, ঢল-বন্যার পরপর প্রধানমন্ত্রী গিয়েছিলেন সুনামগঞ্জের শাল্লায়। সেখানে যেয়ে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কৃষিঋণের সুদ মওকুফের ঘোষণা দেন। কিন্তু প্রায় তিন মাস পর এক অনুসন্ধানে দেখা যায়, স্থানীয়দের অভিযোগ প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী কৃষি ব্যাংকের সুদ এখনও মওকুফ হয়নি। কবে নাগাদ মওকুফ হবে সেটাও জানেন না ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। ফলে নতুন ঋণ গ্রহণে কৃষকেরা পড়েছেন বেকায়দায়। পুরনো ঋণ পরিশোধ না করে নতুন ঋণ গ্রহণের বিধান নেই বলে জানিয়েছেন ব্যাংক কর্মকর্তারা।

সহায়তা পাচ্ছেন জমির মালিকরা, কৃষি শ্রমিকরা বিপন্ন

উল্লেখ্য, ভিজিএফ হোক, ঋণ মওকুফ হোক কোন সরকারি সুবিধাতেই স্থানীয় কৃষি শ্রমিকরা বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না। কারণ সরকার ফসল বিনষ্টের জন্য ক্ষতির যে তালিকা করেছে তাতে জমির মালিকদের নাম রয়েছে। ফলে সহায়তা যা পাচ্ছে তা মুখ্যত জমির মালিকরা। অথচ স্থানীয় শ্রমজীবীরা কেবল কৃষিতে কাজের সুযোগ বঞ্চিত তাই নয়– ধান মার খাওয়ার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া স্বরূপ অন্যান্য বহুভাবেও তারা বিপন্ন। যেমন, নেত্রকোনা জেলার এক অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, সেখানে চালকল আছে মোট ২৪৪টি। অধিকাংশ চালকলের মালিকই ঋণ নিয়ে ব্যাংকে জমি ও বাড়ি বন্ধক রেখেছেন। হাওরের ফসল নষ্ট হওয়ায় পর্যাপ্ত ধানের অভাবে এসব চালকলে একদিকে শ্রমিকরা যেমন কাজ পাচ্ছে না– তেমনি মালিকরাও পড়েছেন আর্থিক সংকটে। ঋণখেলাপি হওয়ার আতঙ্কে আছেন এমন এক চালকল মালিক নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার তমাল অটো রাইস মিলের স্বত্বাধিকারী বলেন,[২৩]

'জনতা ব্যাংকের মোহনগঞ্জ শাখা থেকে মিল ও জমি বন্ধক রেখে ৩ কোটি ১০ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছি। গত বছর প্রচুর ধান এসেছিল মিলে। ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে কোনো সমস্যা হয়নি। কিন্তু এ বছর গত তিনদিনে এসেছে ৫০০ মণ ধান। কিস্তি পরিশোধ করতে না পারলে খেলাপি হয়ে যাব। তখন আমার মিলসহ বসতভিটা নিলামে উঠাবে ব্যাংক।' একইরূপ অবস্থা সুনামগঞ্জেও। সেখানে চালকল আছে ২৬৫টি। সালনা উপজেলার চালকল মালিক জুবায়ের আহমেদ উচ্চসুদে ঋণ নিয়েছেন এনজিও ও স্থানীয় মহাজনের কাছ থেকে। তিনি বলেন, 'এনজিও ও এলাকার লোকের কাছে ঋণ নিয়েছি। এখন মিলে কোনো কাজ নেই। আশপাশের জেলাগুলোতেও একই অবস্থা। বাইরে থেকে ধান আনারও সুযোগ নেই। ধান থাকলে ঋণ থাকত না। কী হবে বুঝতে পারছি না।' এইরূপ পরিস্থিতিতে এলাকার ভূমিহীন খেতমজুররা কাজের সন্ধানে দূর-দূরান্তে গেলেও অনেকেই কাজ না পেয়ে আবার এলাকায় ফিরে আসছে।

[২৩] ২৭ এপ্রিল ২০১৭, বাংলা ট্রিবিউন।

১১

শ্রম আইন সংশোধন উদ্যোগ

গৃহ শ্রমিক ও কৃষি শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি

২০১৭ সালে শ্রম খাতের একটি বড় ঘটনা হলো শ্রম আইন সংশোধনের উদ্যোগ। জুনে এ লক্ষ্যে সরকার একটি ত্রিপক্ষীয় কমিটিও গঠন করেছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বাংলাদেশের শ্রম আইনকে অধিকতর শ্রমিক বান্ধব ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে তাগিদ দেয়ার কারণেই আইনটি সংস্কারের সর্বশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়। এটা হলো বিদ্যমান শ্রম আইন তৈরির পর চতুর্থ সংশোধন উদ্যোগ। বস্তুত পুনঃপুন সংশোধন হওয়াটা আইনটির নিয়তি হয়ে উঠেছে এই কারণে যে, ২০০৬ সালে যখন সংসদে আইনটি প্রণীত হয় তখন জাতীয় সংসদে সামান্যই আলোচনা হয়েছিল। আইনটি 'পাস'-এর প্রক্রিয়ায় সেসময় তাড়াহুড়া ও অগণতান্ত্রিকতা ছিল স্পষ্ট। তারই জের চলছে এক দশক পরও।

সর্বশেষ গত বছর জুনে শ্রমআইন সংশোধনের লক্ষ্যে সরকার ২৪ সদস্যের যে কমিটি গঠন করেছে তাতে অন্যান্যের মাঝে ছিলেন সংশ্লিষ্ট চারটি মন্ত্রণালয়ের একজন করে প্রতিনিধি, মালিকদের বিভিন্ন সংগঠনের সাত জন প্রতিনিধি এবং শ্রমিক সংগঠনগুলোর আট জন প্রতিনিধি। শ্রম আইন সংশোধন সংক্রান্ত এই কমিটিতে আইএলও'র একজন প্রতিনিধিও পর্যবেক্ষক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন– যা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শ্রম মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (শ্রম) কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে প্রায় ছয় কোটি মানুষ এখন 'অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয়' বা 'কর্মরত'। এই 'কর্মরত'দের মধ্যে চার ধরনের মানুষ আছে। ১৫ শতাংশ 'কর্মরত' প্রাতিষ্ঠানিক খাতে। বাকি ৮৫ শতাংশের মধ্যে আত্মকর্মসংস্থানে আছে সোয়া দুই কোটির মতো মানুষ। পারিবারিক ব্যবসায় নিয়োজিত প্রায় সোয়া কোটি এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত প্রায় সোয়া কোটি। শ্রমজীবীদের মধ্যে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরতরা শ্রম আইনের আওতা বহির্ভূত। এই আইনে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সবচেয়ে প্রান্তিক দুই শ্রমিক জনগোষ্ঠী–গৃহকর্মী ও ক্ষেতমজুরদের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। আবার প্রাতিষ্ঠানিক খাতসমূহের অনেকগুলোতেও শ্রম আইনের বাস্তবায়ন অত্যন্ত সীমিত। উপরন্তু শ্রম আইনেই রয়েছে নানানরূপ সীমাবদ্ধতা। যে সীমাবদ্ধতার কারণে প্রাতিষ্ঠানিক খাতেও এই আইন শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় প্রত্যাশিত সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। এইরূপ বাস্তবতা থেকে এই আইনের সংস্কারের দাবি উঠেছে এবং সরকারও শ্রম আইন নতুন করে সংশোধনের লক্ষ্যে উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু এই উদ্যোগ প্রক্রিয়ায় বিশেষভাবে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি আবারও উপেক্ষিত থাকার শংকা করা হচ্ছে। শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্তি না ঘটায় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের মানবাধিকার ও পেশাগত অধিকার বঞ্চনা অত্যধিক। অথচ মোট দেশজ উৎপাদনে অবদান এবং কর্মসংস্থানে গুরুত্ব বিবেচনায় বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ওপর ভিত্তি করেই অগ্রসর হচ্ছে।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী 'অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত' হলো- 'এরূপ বেসরকারি খাত যেখানে কর্মরত শ্রমিকের কাজের বা চাকুরির শর্ত, ইত্যাদি বিদ্যমান শ্রম আইন ও তার অধীন প্রণীত বিধি-বিধানের আওতায় নির্ধারিত কিংবা নিয়ন্ত্রিত নহে এবং যেখানে কর্মরত শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত।' সে হিসাবে দেশের গ্রাম-শহরের অনেক ক্ষুদ্র আয়তনের উৎপাদনই এখনও অপ্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে রয়ে গেছে। তবে কৃষি ছাড়া অপ্রাতিষ্ঠানিক অন্যান্য খাতের সামগ্রিক কর্মসংস্থানের সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া দেশে বরাবরই কঠিন।

বর্তমান শ্রম আইনটি প্রণীত হয় ২০০৬ সালে। এই আইন পরবর্তীকালে ২০০৯, ২০১০ এবং ২০১৩ সালে সংশোধন হয়। আর এই আইন নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ দ্বারা। শ্রম বিধিমালা হলো শ্রম আইন বাস্তবায়নের খুটিনাটি বিষয়গুলোর

বিস্তারিত বিবরণ।

শ্রমিক অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান শ্রম আইনে দুই ধরনের ত্রুটি রয়েছে বলে শ্রমিক সংগঠকরা অভিযোগ করছেন। প্রথমত আইনে বাস্তব কিছু সমস্যা মোকাবেলায় কোন বিধানই রাখা হয়নি। এটা হলো আইনটির অসম্পূর্ণতার দিক। দ্বিতীয়ত অনেক সমস্যার সমাধানে আইন অকার্যকরী প্রমাণিত হচ্ছে। এটা হলো আইনটির সীমাবদ্ধতার দিক। প্রথম ধরনের অসম্পূর্ণতার মধ্যে রয়েছে বিশেষভাবে যৌন হয়রানির বিষয়টি। বর্তমানে অনেক শিল্পখাতই নারী প্রধান হয়ে উঠেছে এবং সেখানে সহকর্মী ও উর্ধ্বতনদের দ্বারা নারী শ্রমজীবীদের যৌন হয়রানির ঘটনাও ঘটছে। কিন্তু যৌন হয়রানির প্রতিরোধে, মোকাবেলায়, তদন্তে ও বিচারের ক্ষেত্রে শ্রম আইনে পর্যাপ্ত কোন নির্দেশ নেই। (এ বিষয়ে এই প্রতিবেদনের অন্যত্র একজন শ্রম আইনজীবীর মতামত রয়েছে।) এছাড়া বর্তমান শ্রম আইনের সুরক্ষা থেকে ইপিজেডের শ্রমিকদের বঞ্চিত করা হয়েছে। দেশের সংবিধান মানুষকে সংঘবদ্ধ হওয়ার যে শর্তহীন গ্যারান্টি দেয় ইপিজেডের শ্রমজীবীদের কার্যত তা থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে তাদের শ্রম আইন বহির্ভূত করে দিয়ে। সেখানে চাকুরির শর্ত ও শ্রম অধিকার ইপিজেড কর্তৃপক্ষের কিছু নির্দেশনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। অধিকার নেই পূর্ণাঙ্গ ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের। যৌথ দরকষাকষি অধিকারও সীমিত। শ্রমিকদের কল্যাণ সমিতিধর্মী যেসব উদ্যোগের কথা ইপিজেড কর্তৃপক্ষ বলে থাকেন– কার্যক্ষেত্রে তাও স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হতে দেয়া হয়নি। ফলে দেশের ভেতরে থেকেও ইপিজেডগুলো আইন-উর্ধ্ব এক এলাকায় রূপ নিয়েছে। সেখানকার শ্রমিকদের জন্য শ্রম আদালতের এখতিয়ারও সীমিত করে রাখা হয়েছে। তবে ২০১৭ সালে সরকার এই মর্মে একটা ধারণা দেয় যে, শ্রম আইনের সম্ভাব্য সংশোধনে ইপিজেডের শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এ কারণেই ট্রেড ইউনিয়ন গঠন আরো সহজীকরণের লক্ষ্যে ইপিজেড আইন (সংশোধন)-এর খসড়া সংসদীয় স্থায়ী কমিটি থেকে ফেরত আনা হয়। অন্যদিকে শ্রম আইনের উপরে উল্লিখিত দ্বিতীয় ধরনের সমস্যার মধ্যে রয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ক্ষেত্রে– বিশেষত ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে এই আইন শ্রমিক বান্ধব নয়। আইনে কারখানা পর্যায়ে যে 'পার্টিসিপেটরি কমিটি' গঠনের বিধান রয়েছে–তারও অপব্যবহার হচ্ছে। মালিকরা নিজেদের পছন্দসই ব্যক্তিদের দিয়ে এসব কমিটি গঠন করে রাখছেন।

বর্তমানে তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিক সংগঠকদের একটি নিত্য অভিযোগ হলো ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার উদ্যোগ নেয়া হলে সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়াই তা নাকচ হয়ে যাচ্ছে। এইরূপ অভিজ্ঞতা লক্ষ্য করা গেছে টেলিকম সেক্টরের মতো ব্যাপকভাবে বিকাশমান খাতেও। ইউনিয়ন গঠনের জন্য আইনে ৩০ শতাংশ শ্রমিকের সক্রিয় সমর্থনের যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে তা আন্তর্জাতিক শ্রমমানের সঙ্গে মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আবার কোন প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলায় উদ্যোগী ভূমিকার কারণে মালিকরা অনেক সময়ই সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের প্রতি যে প্রতিহিংসামূলক আচরণ করে থাকেন বর্তমান শ্রমআইন তারও সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন উদ্যোগে যুক্ত শ্রমিকদের চাকুরিচ্যুতি রোধ বা তাদের পুনর্বহাল বিষয়ে শ্রম পরিচালকের ভূমিকা ও দায়বদ্ধতার বিষয়ে আইন আরও সুনির্দিষ্ট ও শ্রমিক বান্ধব হওয়া প্রয়োজন। শ্রম আদালতসমূহের দীর্ঘসূত্রিতা কমাতেও বর্তমান শ্রম আইন ব্যর্থ হয়েছে বলা যায়।

অতীতে শ্রম আইনের যত দফা সংশোধন করা হয়েছে তার বড় দুর্বলতা ছিল অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে তাতে অন্তর্ভুক্ত না করা। যেমন, সরকার দেশের লাখ লাখ গৃহ পরিচারিকাদের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করলেও তাকে আইনগত মর্যাদায় বলবৎযোগ্য করা হয়নি। ফলে মাঠ পর্যায়ে এর কোন সুফল পাওয়ার সুযোগ নেই। অথচ দেশে প্রায় ২০ লাখ গৃহকর্মী রয়েছে। এরূপ আরও কিছু খাতে শ্রমজীবীরা আইনের সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে 'শ্রমিক'-এর সংজ্ঞা প্রসারিত না করার কারণে।

১২

ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার

চর্চা, বাধা ও বিতর্ক

সরকারি হিসাবে প্রায় আট হাজার ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে বাংলাদেশে। তবে অন্যান্য বছরের চেয়ে এ বছর (২০১৭) শ্রম অধিকার তথা ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের ক্ষেত্রে একটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের বাইরেও শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকারের চর্চা অতীতের চেয়ে সংকুচিত হয়ে পড়েছে।

উল্লেখ্য, ১৯৭৭ সালে শিল্প সম্পর্কিত অধ্যাদেশে 'সার্বক্ষণিক' ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের কলকারখানায় শ্রমিক প্রতিনিধিত্বের নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়। সেই সঙ্গে একটি ইউনিয়ন গঠন করার জন্য কমপক্ষে কারখানার মোট শ্রমিকের ৩০ শতাংশের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়। এ দুটি বিধান ছিল ট্রেড ইউনিয়নকেন্দ্রীক শ্রমিক অধিকার চর্চার পথে একটি প্রতিবন্ধকতা। এ দুটি 'পরিবর্তন' আইএলওর অন্তত দুটি গুরুত্বপূর্ণ কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮-এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এর বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর জোরালো প্রতিবাদের পরেও ২০১৭ পর্যন্ত শ্রমিক স্বার্থবিরোধী এ দুটি কালো আইন বাতিল হয়নি।

শ্রমিক নেতারা বলছেন, যে কোনও কারখানার ৩০ ভাগ শ্রমিক সম্মিলিত হলেই ওই কারখানার শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারবে–এইরূপ বিধান বাস্তব সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। শ্রমিক ফেডারেশন নেতা তৌহিদুল ইসলাম বলেন, তিন শ' শ্রমিকের কারখানায় ৯০ শ্রমিকের সম্মতি পেলেই ইউনিয়ন করতে পারার কথা। অথচ ইউনিয়নের আবেদন জমা দেওয়ার পর হুট করে মালিক ও শ্রমদফতরের যৌথ তরফ থেকে কাগজেপত্রে কারখানার শ্রমিকসংখ্যা বাড়িয়ে বলা হয়–৩০ শতাংশ সম্মতি না পাওয়ায় অনুমতি দেওয়া গেল না। এছাড়া ভিন্নধর্মী সমস্যাও রয়েছে।

বাংলাদেশের শ্রমপরিচালক ও রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিসের হিসাবে দেশে ৭ হাজার ৭২৬টি ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ২৮ লাখ ১ হাজার ৫৯৪ জন। তবে এ সংখ্যা কতটা সঠিক– সে নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কারণ অনেক সময় বন্ধ কলকারখানার হিসাব সঠিকভাবে নিবন্ধিত হয় না। আবার প্রয়োজনীয় সদস্য সংখ্যা না থাকা সত্ত্বেও অনেক ইউনিয়ন বাতিল হয় না।

দেশের একজন শ্রমিক নেতা ২০১৭ সালের ৬ জুন দৈনিক বণিক বার্তায় প্রকাশিত তাঁর এক লেখায় দাবি করেছেন, বর্তমানে মোট গার্মেন্টস কারখানাভিত্তিক ইউনিয়নের সংখ্যা ৫৫৫ এবং ফেডারেশনের সংখ্যা ৪৫। গার্মেন্ট কারখানার সংখ্যা ৬ হাজার ১০০। গ্লোবাল ইউনিয়ন ফেডারেশন 'ইন্ডাস্ট্রিয়ালঅল', আইএলও এবং অনেক দাতা সংস্থা গার্মেন্ট খাতকে সংগঠিত করার জন্য কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে চলেছে। তবু এখাতে এখনও সংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যা ১ শতাংশের নিচে।

এরকম অবস্থায় শ্রমিকদের ব্যাপক উপস্থিতি রয়েছে এমন এলাকাগুলোতে তাদের সংগঠিত করতে শ্রমিক সংগঠকদের আগ্রহের পটভূমিতে ২০১৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি শ্রম প্রতিমন্ত্রী সংবাদ সম্মেলন করে বলেছেন, 'আশুলিয়া ও গাজীপুর এলাকায় পোশাক কারখানাকে কেন্দ্র করে অনেক অনিবন্ধিত ট্রেড ফেডারেশন, বিভিন্ন এনজিও, যাদের এখানে কোনো কাজ নেই, তারাও সেখানে অফিস করে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে শ্রমিকদের বিভ্রান্ত করেন। আমরা ঐক্যমতে এসেছি আশুলিয়াসহ বিভিন্ন গার্মেন্টস এলাকায় কোনো রকম আনরেজিস্ট্রার্ড (অনিবন্ধিত) ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের অফিস থাকবে না এবং কোনো এনজিওর অফিস থাকবে না। যারা নাকি রেজিস্ট্রার্ড ইউনিয়ন, গুড লেবার প্র্যাকটিস করছেন, তাদের অফিস সেখানে থাকবে। এতে সরকারের কোনো আপত্তি নাই।' শ্রমমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পর উল্লিখিত এলাকাগুলোতে শ্রমিক সংগঠকদের কার্যক্রম অধিকতর সংকুচিত হয়ে পড়েছে।

এদিকে ২০১৭ সালের এপ্রিলে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফরে আসে। যাওয়ার আগে দলটি শ্রম অধিকারের বিষয়ে কিছু পরামর্শ রেখে গেছে। এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে ইপিজেডে (রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ জোন) নিয়মিত ট্রেড ইউনিয়ন চালুর

উদ্দেশ্যে নতুন শ্রমআইন প্রণয়ন বা বর্তমান আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া, ট্রেড ইউনিয়ন করার বাধা অপসারণ এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে সক্রিয় হতে সহায়তা দেওয়া।

উল্লেখ্য, দেশের আট ইপিজেডে প্রায় চার লাখ শ্রমিক কাজ করছে। বাইরের শ্রমিকদের চেয়ে তারা তুলনামূলকভাবে বেশি বেতন ও সুযোগ-সুবিধা পেলেও এখানকার শ্রমিকরা চান নিজেদের মধ্যে শ্রমিক সংগঠন তৈরি করতে।

এদিকে ২০১৭ সালে ট্রেড ইউনিয়ন খাতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল 'গার্মেন্ট শ্রমিক অধিকার আন্দোলন' এবং 'বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক শিল্প ঐক্য' নামে নতুন দুটি শ্রমিক জোটের আবির্ভাব। গার্মেন্ট শ্রমিক অধিকার আন্দোলনে রয়েছে গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরাম, বাংলাদেশ গার্মেন্টস টেক্সটাইল ফেডারেশন, বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি, গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনসহ ১২টি সংগঠন এবং বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক শিল্প ঐক্যে রয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী লীগ, গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী লীগ, রেডিমেড গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন, গণতান্ত্রিক গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন, মুক্ত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন, একতা গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন, গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন, বাংলাদেশ পোশাক শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, বাংলাদেশ রেডিমেড গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন, বাংলাদেশ গার্মেন্টস টেক্সটাইল শ্রমিক ফেডারেশন, গ্রিন বাংলা গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন, বাংলাদেশ ট্রাস্ট গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন ও বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংগঠন।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ২০১৭ সালে বাংলাদেশের কারখানার কমপ্লায়েন্স আলোচনায় অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন করা ও দর কষাকষির ক্ষমতা (সিবিএ) সবচেয়ে আলোচিত ইস্যু থাকলেও শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের (ডিআইএফই) পরিদর্শনের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৯৭ শতাংশ কারখানায়ই ট্রেড ইউনিয়ন নেই। অর্থাৎ মাত্র তিন শতাংশ কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন আছে। প্রতিবেদনে তৈরি পোশাক মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ, বিকেএমইএ'র সদস্য বহির্ভূত কারখানাকেও হিসাবে আনা হয়েছে। জরিপ চালানো ২ হাজার ৫৮টি কারখানার মধ্যে ৬৩টি কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন পাওয়া গেছে। ২ হাজার ৫৮টি কারখানা ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিদর্শনের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। পরিদর্শনকৃত কারখানার ১ হাজার ২৪৫টি বিজিএমইএ'র সদস্য। এর মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন রয়েছে, এমন কারখানা ১৯। বিকেএমইএ'র ৪১৭টি'র মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন আছে ৩৯টিতে। আর এ দুই সংগঠনের কোনটিরই সদস্য নয়, কিন্তু রপ্তানি প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত এমন ৩৯৬টি কারখানার মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন পাওয়া গেছে মাত্র ৫টিতে। সব মিলিয়ে ৩ শতাংশ কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন পাওয়া গেছে।

উপরোক্ত বাস্তবতায় শ্রমিক অধিকার নিয়ে কাজ করেন এমন সংগঠনের প্রতিনিধিরা বলছেন, গত তিন বছরে ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে যত কথা বলা হয়েছে, প্রকৃত অর্থে কাজ হয়েছে খুবই কম।

১৩

টাম্পাকো দুর্ঘটনা

বেকারত্ব ঘোচেনি চাকুরি হারানো শ্রমিকদের

২০১৬ সালের বাংলাদেশে একটি বড় শিল্প দুর্ঘটনা ছিল টাম্পাকো ফয়েলস লি. নামক কারখানার বিধ্বস্থ হওয়া। উল্লিখিত বছরের ১০ সেপ্টেম্বর এই দুর্ঘটনা ঘটে। যেহেতু ২০১৭ জুড়ে এই দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কর্মকান্ড অব্যাহত ছিল সেই কারণে এ নিয়ে বর্তমান প্রতিবেদনে একটি অধ্যায় যুক্ত করা হচ্ছে।

এই দুর্ঘটনায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী উদ্ধার তৎপরতা পরিচালনা করে। সেসময় ৩৯ টি লাশ উদ্ধার হলেও কারখানার বাইরেও দুজন মারা গেছেন। এভাবে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪১ জন। আহত হয়েছেন প্রায় অনুরূপ সংখ্যক ব্যক্তি। প্রায় দুই সপ্তাহ যাবৎ উদ্ধার তৎপরতা শেষে সেনাবাহিনী এলাকা ত্যাগ করার পরই মালিকপক্ষীয়রা তাৎক্ষণিকভাবে কারখানার কর্তৃত্ব গ্রহণ করে।

ক্ষতিপূরণ প্রশ্ন

এই শিল্প দুর্ঘটনায় মৃত ও আহত সকলের পরিবারের বিদ্যমান শ্রম আইনে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার থাকলেও প্রথমে কেবল যেসব পরিবার ডেথ সার্টিফিকেট দেখাতে পেরেছিল তাদের জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ২০ হাজার টাকা দেয়া হয় 'দাফন বাবদ'। পরবর্তীকালে একইভাবে শ্রম মন্ত্রণালয়ের শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে ৩২ জন নিহতের পরিবারকে তিন লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। কারখানায় ৩৯ জন নিহত হলেও প্রায় ১৬ দিন পর উদ্ধারকৃত তিনজনের লাশ শনাক্ত করা যায়নি এবং বাকি চার জন সম্পর্কে 'সঠিক তথ্য'-এর অভাবে তারা এই ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়ে। আহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় ৫০ হাজার টাকা করে। কোম্পানির পক্ষ থেকেও নিহতদের পরিবারকে এক লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তখন। তবে শ্রম আইন অনুযায়ী টাম্পাকোর শ্রমিকরা এক মাসের বকেয়া বেতন এবং চাকুরি হারানোজনিত চার মাসের মজুরি পাওয়ার অধিকারী হলেও উক্তরূপ কোন ক্ষতিপূরণ তারা এই প্রতিবেদন লেখার সময়ও পাননি।

টঙ্গীর বিসিক শিল্প নগরীতে ৪০ হাজার বর্গফুট জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত টাম্পাকো ফয়েলস লি. কারখানাটি আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন নামি-দামি ব্র্যান্ডের জন্য মালামাল প্রস্তুত করত। যার মধ্যে ছিল ব্রিটিশ টোব্যাকো কোম্পানি, নেসলে মিল্ক ইত্যাদি। সামাজিক দায়িত্ববোধ অনুযায়ী তারাও নিহত ও আহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথা থাকলেও সেরূপ কিছু ঘটেনি এক্ষেত্রে।

দুর্ঘটনার কারণ

উল্লেখ্য, টাম্পাকো কারখানাটি প্রাথমিকভাবে ক্ষুদ্র শিল্প হিসেবে অনুমোদন নিয়েছিল। পরে তা মাঝারি শিল্পের জন্য অনুমোদন নিলেও কারখানাটিতে ভারি শিল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপিত হয়। দুর্ঘটনাটি ঘটে কারখানার বয়লার ও গ্যাস সংযোগে ত্রুটির কারণে। প্রচারমাধ্যমের ভাষ্য মতে কারখানাটিতে চারটি বড় বয়লার স্থাপিত ছিল। কারখানার নিচে প্রচুর কেমিকেল ছিল– ফলে বয়লার এবং সংশ্লিষ্ট গ্যাস লাইনে ত্রুটি থেকে সৃষ্ট বিস্ফোরণে কেমিকেলে আগুন ধরে যায় এবং দ্রুত তা পুরো কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে। তবে তিতাস গ্যাসের তদন্ত দল তাদের তদন্ত শেষে বলেছে, তাদের গ্যাস লাইন সংক্রান্ত কোন ত্রুটির কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেনি।

দুর্ঘটনার পর দীর্ঘদিন টঙ্গী সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন টাম্পাকো কারখানার শ্রমিক কামরুল হাসান ঘটনার বর্ণনা দিয়ে জানান, ওই দিন তিনি নাইট ডিউটি শেষ করে ভোর ছয়টার দিকে গেইটে আসেন। তখন দেখতে পান সিকিউরিটি রুমের পেছনে বয়লার রুমের গ্যাসের সিলিন্ডার থেকে গ্যাস বের হচ্ছে। কারখানার শিফট ইনর্চাজ সুভাষ চন্দ্র দাস অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে ঘটনাটির ব্যাপারে কারখানার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মুঠোফোনে কথা বলছিলেন, ঠিক তখনই বিকট শব্দে প্রশাসনিক ভবনে বিস্ফোরণ ঘটে এবং ভবনটি রাস্তায় ধসে পড়ে।

টাম্পাকোর বিপরীত পাশে অবস্থিত মেনেকো মোটরসের নিরাপত্তা প্রহরী শফিকুল জানান, ধ্বংসাবশেষ ছিটকে পড়ায় তিনি পায়ে ও মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হন। বিস্ফোরণের প্রচন্ড শব্দে পুরো এলাকাটি কেঁপে ওঠে। চারপাশের কারখানা ও বাড়িগুলোর কাঁচ ভেঙে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। কারখানার উত্তর পাশে আবুল মাতব্বরের বাড়ির ১০টি রুম কারখানার দেয়ালচাপা পড়ে

মিশে যায়। একজন নারী ও আসিক নামের ১২ বছরের একজন বালক দেয়ালচাপা পড়ে নিহত হয়।

কারখানার পশ্চিম পাশে সুরুজ মিয়ার বাড়ির (রেললাইনের পাশে) বাসিন্দা শিউলি আক্তার জানান, প্রচন্ড শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘর থেকে বের হয়ে দেখেন, কারখানার পাশ দিয়ে দুই জন মানুষ হেঁটে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ মোটা এক টুকরা লোহার দন্ড ছিটকে এসে তাদের একজনের মাথায় পড়ে, এতে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং পুরুষটিও আঘাতপ্রাপ্ত হন। তিনি আরও জানান, এ সময় কারখানার দিকে তাকিয়ে দেখেন অনেক শ্রমিক জানালার ভেতর দিয়ে হাত নেড়ে 'আমাদের বাঁচান, বাঁচান' বলে চিৎকার করছেন। মুহূর্তেই আগুনের লেলিহান শিখা আর কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ায় আর কিছু দেখা সম্ভব হয়নি।

দুর্ঘটনার সময় এই কারখানায় প্রায় ১০০ কর্মী অবস্থান করছিলেন বলে দাবি করেছে শ্রমিকরা। দুর্ঘটনার পরপরই ঘটনাস্থলে উপস্থিত গাজিপুরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ হারুণ অর রশিদ 'দায়িত্বে অবহেলার প্রমাণ' পাওয়া গেছে উল্লেখ করে বলেছিলেন মালিককে গ্রেফতার করা হবে।

দুর্ঘটনার দায়-দায়িত্ব

এই দুর্ঘটনায় মূল দায় মালিকের হলেও এবং ১৭ সেপ্টেম্বর টঙ্গী থানায় এসআই অজয় কুমার চক্রবর্তী কর্তৃক মালিকের বিরুদ্ধে মামলা হলেও কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে প্রচারমাধ্যম সূত্রে জানা যায় না। টাম্পাকো মালিক মকবুল আহম্মেদ সিলেট-৫ এলাকার একজন সাবেক সংসদ সদস্য এবং রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী। তিনি বিসিক মালিক সমিতি, টঙ্গীর সভাপতি। স্থানীয় শিল্প মালিকরাও তাঁর যেকোন শাস্তির বিরুদ্ধে বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে।

অজয় কুমার চক্রবর্তী-এর মামলা ছাড়াও এই দুর্ঘটনায় ১২ সেপ্টেম্বর নিহত শ্রমিক জুয়েলের বাবা আবদুল কাদের বাদি হয়ে মালিক মকবুল হোসেনসহ আট কর্মকর্তাকে আসামী করে একটি মামলা করেছিলেন। প্রচারমাধ্যমের ভাষ্য অনুযায়ী এসব মামলায় আসামীদের মধ্যে ছিলেন কারখানার চেয়ারম্যান মকবুল ছাড়াও তার স্ত্রী সাজেদা পারভীন হোসেন, ছেলে টাম্পাকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ তানভীর আহমেদ ও মেয়ে আবিদা হোসেন, টাম্পাকোর মহা-ব্যবস্থাপক শফিকুর রহমান, ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মনির হোসেন, ডিএমডি সাফি-উস-সামি আলমগীর ও ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও আইন) আবু হানিফ। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সুমন ভক্ত জানান, পরবর্তীকালে টাম্পাকোর মামলায় আসামিরা উচ্চ আদালতে জামিন আবেদন করলে মকবুল হোসেনের স্ত্রী সাজেদা পারভীন হোসেন ও তার মেয়ে সৈয়দা আবিদা হোসেনকে আট সপ্তাহের জন্য জামিন দেয়া হয় এবং অন্যদের এক মাসের মধ্যে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়। এরপর নিম্ন আদালত থেকে মকবুল হোসেনও জামিন পেয়ে যান।

এসব মামলা ছাড়াও ক্ষতিপূরণ প্রশ্নেও ১৯ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টে রিট করে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি (বেলা) নামের তিনটি মানবাধিকার সংগঠন। এই মামলার ফলে ২৬ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি আশীষ রঞ্জন দাসের বেঞ্চ মালিকের ব্যাংক হিসাব জব্দে বাংলাদেশ ব্যাংককে নির্দেশ দেন। তবে ওই অ্যাকাউন্ট থেকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য অর্থ উত্তোলন করা যাবে। উপরোক্ত মামলাসমূহ চলমান থাকাবস্থাতেই ১০ আগস্ট টঙ্গীতে এক অনুষ্ঠানে মামলার আসামীদের উপস্থিতিতেই মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে টাম্পাকোর নতুন ভবন উদ্বোধন করতে দেখা যায়। যদিও সেসময়ও কয়েকজন শ্রমিকের লাশের ডিএনএ পরীক্ষা অসমাপ্ত ছিল এবং তাদের লাশ মর্গেই পড়েছিল।

শ্রমিকদের বর্তমান অবস্থা

শ্রমিক পরিবারগুলো বর্তমানে আর্থিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত ও চরম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। যদিও অনেক পরিবারই শেষ পর্যন্ত বড় অংকে ক্ষতিপূরণ পেয়েছে, কিন্তু নিহতদের পরিবারগুলো পরিবারের কাজের লোকটিকে হারিয়ে দীর্ঘমেয়াদে বিপদগ্রস্ত। অল্প আহতরা চিকিৎসার খরচ চালাতে না পেরে অসুস্থ শরীর নিয়েই কাজের সন্ধান করছেন। আবার শারীরিকভাবে মারাত্মক আহতরা চিকিৎসার অভাবে মানসিক ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলছেন। কিন্তু ২০১৭ সালের ১০ আগস্ট টাম্পাকো কর্তৃপক্ষ নতুন ভবনে স্থানান্তরিত তাদের কারখানায় আহত পরিবারগুলো থেকে মাত্র একজনকে চাকুরি দেয়ার ঘোষণা দেয়।

শ্রমিক সংগঠনগুলোর ভূমিকা

রানা প্লাজা দুর্ঘটনার সময় দেশের শ্রমিক সংগঠন ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো যেরূপ সোচ্চার প্রতিবাদে শামিল হয়– টাম্পাকোর সময় সেটা ঘটেনি। ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকেরা মনে করে, শ্রমিকদের আন্দোলনের চাপ তেমন জোরালো না হওয়ায় এই ঘটনায় মালিকপক্ষ নীরবে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ এড়াতে পারছে।

১৪ সাক্ষাৎকার

শ্রমিক নেতা, কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক, শ্রম আইনজীবী

‘গণতান্ত্রিক একটা শ্রম আইন হলো না এদেশে, এটা বিশাল এক ব্যর্থতার জায়গা’

– মোশরেফা মিশু, সভাপতি, গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরাম

সামগ্রিকভাবে দেশের শ্রম পরিস্থিতি এবং বিশেষভাবে ২০১৭ সালের শ্রম বিষয়ক পরিস্থিতি নিয়ে শ্রমিক নেত্রী মোশরেফা মিশুর এই সাক্ষাৎকারটি নেয়া হয় ২০১৭ সালের ২৫ জুলাই তাঁদের সংগঠনের তোপখানা রোডস্থ কার্যালয়ে।

শ্রমিক রাজনীতিতে কতদিন হলো আপনার?

সেই ১৯৯৫ সালে যুক্ত হই। সেই হিসাবে ২২ বছর তো হলো।

এত দীর্ঘ সময় পার হয়ে এলেন। কতটুকু কী করতে পারলেন; তৃপ্ত আপনি?

তৃপ্ত নই। সংগঠনগতভাবেও সন্তুষ্ট নই। একটা বড় স্বপ্নের জায়গা ছিল শ্রমিকরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে। সমাজে একটা গণতান্ত্রিক আবহ আসবে। একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারবো আমরা। কারখানা থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত একটা গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে উঠবে– সেসব তো হলো না বা হচ্ছে না। এখনো শ্রমিক সমাজ অসংগঠিতই বলা যায়। এখনো ‘মে দিবস’ কি কেন– এটাও অনেক শ্রমিক জানেন না।

তবে কিছু অর্জন তো আছেই। যেমন আমি বিশেষভাবে ২০০৬ সালের গার্মেন্ট খাতের আন্দোলনের কথা বলবো। এই আন্দোলনের মধ্যদিয়ে অন্তত মালিকদের একাংশের একটা উপলব্দি হয়েছে দেশে ট্রেড ইউনিয়নকে কাজ করতে দিতে হবে। পরিচয়পত্র, আইডি কার্ড, মাতৃকালীন ছুটি, মজুরি বোর্ডের বিষয়গুলো এখন আর অবহেলা করা যাচ্ছে না। যদিও এগুলোর মধ্যেও বিস্তর ফাঁক-ফোকর আছে। গণতান্ত্রিক একটা শ্রম আইন হলো না এদেশে। এটাও বিশাল এক ব্যর্থতার জায়গা। আবার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র না থাকায় মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারও নেই।

বর্তমান শ্রম আইন সম্পর্কে আপনার আপত্তির জায়গা কোথায়?

আপত্তির জায়গা অনেক। এটা মালিকদের পক্ষে গেছে। এই আইনে পোশাক খাতে ট্রেড ইউনিয়নের বদলে ‘পার্টিসিপেটরি কমিটি’ গঠনের কথা বলেছে। এটা তো বিশ্বস্বীকৃত কোন ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার হলো না। মজুরির ক্ষেত্রে দেখুন, এত কম মজুরি বিশ্বের কোথাও নাই। চা হোক, গার্মেন্ট হোক– সবক্ষেত্রেই এই অবস্থা। ক্ষতিপূরণ আইনেও বড় ধরনের সংস্কার হয়নি। শ্রমিক ছাটাইয়েও এই আইন শ্রমিকদের খারাপ অবস্থায় ফেলার সুযোগ করে দিয়েছে। এই শ্রম আইন নিরাপদ ও গণতান্ত্রিক শ্রম পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারেনি। পারছে না। কারখানাগুলোতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নাই। নিরাপদ পরিবেশ নাই। শ্রম আইন করার সময় আমরা যেসব সুপারিশ রেখেছিলাম সেসব বিবেচনা করা হয়নি।

আপনি ক্ষতিপূরণ নিয়ে আপত্তির কথা বললেন। আপনাদের বক্তব্য কী এই ক্ষেত্রে?

একজন মানুষ যখন কর্মক্ষমতা হারায় তখন তার বাকি বয়সের হিসাব করতে হবে। সুস্থ অবস্থায় সে কতদিন কাজ করতে পারতো, কত আয় করতে পারতো এই হিসাব ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে জরুরি; পাশাপাশি আহত মানুষটার চিকিৎসার প্রশ্ন আছে। এসব মিলে আমরা দেখেছি ক্ষতিপূরণের বর্তমান অংকটা বাস্তবসম্মত নয় এবং অপ্রতুল।

দেশে শ্রমিক রাজনীতির পরিসরও বাড়ছে না। অথচ শিল্প অর্থনীতির পরিসর অনেক বেড়েছে–

শ্রমিক রাজনীতির পরিসর বাড়ছে না দুই কারণে। প্রথমত সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন এটা হতে দেবে না। বরং ট্রেড ইউনিয়ন আছে এমন শিল্পখাতই বন্ধ করে দেবে। অন্যদিকে, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের দেশীয় রাজনৈতিক সহযোগীরাও শ্রমিকদের সাংগঠনিক বিকাশ চায় না। একই কারণে ভারী শিল্পের বিকাশ ঘটানো হয়নি। নাজুক ধাঁচের খাতগুলোই বিকশিত হচ্ছে।

পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, শ্রমিকরা আর সংগঠনে আসছে না আগের মতো। কেন আসছে না?

একজন শ্রমিককে কয়বার মরতে বলেন? ওরা তো প্রতিমুহূর্তেই মরে আছে। তারা চূড়ান্ত হতাশ। একজন শ্রমিকের সামাজিক মর্যাদা নাই। সন্তানদের ঠিক মতো প্রয়োজনীয় রসদ যোগাতে পারে না। ফ্যাক্টরিতে সামান্য কথা বলা যায় না। মালিক মাস্তান ডেকে পিটিয়ে বরখাস্ত করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। আর পুলিশ তখন দেয় রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা। এইরূপ ঘটার পর তার ফ্যামিলির অবস্থা ভাবুন। বহুমাত্রিক দমনপীড়নের এই জীবনে থাকা মানে মৃতের মতো থাকা। এরকম বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে সে কীভাবে স্বপ্ন দেখবে? সে কীভাবে সংগঠন করার সাহস পাবে? তার জীবনে কোন অনুপ্রেরণা নাই। সমাজে কেউ তার পাশে নাই। আমরা চেষ্টা করি তাদের উজ্জীবিত করতে। কিন্তু বাস্তব হতাশা থেকে তাকে কতটা আর বের করা যায়। তাদের মনে কাজ করে– 'এসব করে আর কি হবে?' তাছাড়া আমাদের খোদ মিডলক্লাসই দেশ নিয়ে–সমাজ নিয়ে আর স্বপ্ন দেখে না। নব্বুয়ের পর মিডল ক্লাসের কোন বড় আন্দোলন সংগ্রাম দেখা গেছে? যে তরুণ-তরুণীরা বিশ্বসাহিত্য পড়ছে, মেধাবি, উচ্চ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের কথা বলে– তারাও দেখি এখন বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে পুলিশ ক্যাডারে চাকুরি করতে চায়।

আপনি সাংস্কৃতিক হতাশার কথা বললেন। মাঠ পর্যায়ে শ্রমিক সংগঠকরা ঠিক কী ধরনের সংকট মোকাবেলা করছে?

ভয়াবহ সংকট মোকাবেলা করতে হচ্ছে। একজন শ্রমিক সংগঠক হয়তো গতানুগতিক পেশাগত বিষয় নিয়ে কথা বলছে–তার বিরুদ্ধে দেয়া হচ্ছে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা। বোমাবাজি ও ভাঙ্গচুরের মামলা। তার কাজের জায়গাটাকে ক্রিমিনালাইজ করে ফেলা হচ্ছে। সরকার বা মালিকরা এটা বুঝতে চাইছে না– আলাপ আলোচনার একটা পরিসর থাকা দরকার। তাদের মাঝে আলোচনার কোন মনোভাবই নাই। যেমন ধরুন, এ বছর ২০১৭ সালে আমরা বিভিন্ন সংগঠন গার্মেন্ট খাতে নতুন বেতন কাঠামোর দাবি করে স্মারকলিপি দিলাম সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোতে। কোথাও থেকে একটু কথা বলার জন্য আহ্বান করা হলো না। তাহলে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কোথায় দাঁড়িয়ে শ্রমিক সংগঠকরা কাজ করবে? আমি ২২ বছর ধরে শ্রমিক সংগঠক হিসেবে কাজ করছি। আমাকে ২০১১-এর মার্চে আটক করে নিয়ে যাওয়া হলো রাত দেড়টায়। কোন ওয়ারেন্ট ছাড়া সাদা পোশাকে এই কাজ করা হলো। আমি কি পলাতক কোন অপরাধী? আবার ধরে নিয়ে সকালে প্রচারমাধ্যমের কাছে অস্বীকার করা হলো আটকের কথা। কোর্টেও নেয়া হলো দেরিতে। আমি অসুস্থ। আটক অবস্থায় কোন ওষুধও দেয়া হলো না। এই হলো অবস্থা। মাঠ পর্যায়ে সংগঠকদের কথায় কথায় হুমকি দেয়া হয়। দেখুন, গাজিপুরে আনাচে কানাচে কত কারখানা। কোন শ্রমিক দল যদি বহু দূরে গাজিপুর চৌরাস্তাতেও একটা মানববন্ধন করতে চায় তাও হামলার শিকার হবে। সাভার, গাজীপুর, আশুলিয়ায় সামান্য কোন সভাও প্রকাশ্যে করা যায় না। গত বছর আমরা স্রেফ একটা প্রেস কনফারেন্স করতে গিয়ে গ্রেফতার হই। মাঠ পর্যায়ে আশুলিয়ায় শ্রমিকদের আটক করা হয় ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দেয়া হয়। মজুরি বৃদ্ধির সঙ্গে রাষ্ট্রদ্রোহিতার কী সম্পর্ক? আশুলিয়ায় শ্রমিকরা স্রেফ মজুরির বিষয়টি পুনর্বিবেচনার কথা বলেছিল। অথচ ১ হাজার ৫০০ শ্রমিক ছাটাই করা হলো। আর ১ হাজার ৬০০ শ্রমিকের নামে মামলা হলো। বাড়িতে বাড়িতে তল্লাশি শুরু হলো। শ্রমিককে না পেলে পরিবারকে হেনস্তা করা হলো। আমাদের একজন সিনিয়র সহযোগী নেতা একটা কথা বলেছেন, গত ৫০ বছরে এত সংকট দেখেননি তিনি শ্রমিক পরিমন্ডলে।

আগে জাতীয় রাজনীতিতে ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের একটা অবস্থান ছিল, দাপট ছিল– এখন সেটা আর নেই। এই অবস্থা হলো কেন?

এটা ঠিক, পূর্বের সেই জায়গাটা আর নাই। দাপট হারিয়ে ফেলাটা বৃহত্তর সমাজের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক অধঃপতনের কারণেই হয়েছে। আজকে

শ্রমিক রাজনীতিতেও সংগঠকের বড় অভাব। শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা আসছে না। রিক্রুটমেন্ট সেভাবে নাই। পুরানো নেতৃত্ব নতুন পরিস্থিতি ও নতুন গড়ে ওঠা খাতগুলোতে কাজ করতে যেয়ে সফল হবেন বলে মনে হয় না। আবার শ্রমিক রাজনীতিতে ঐক্যেরও সংকট রয়েছে। সবাই ঐক্যবদ্ধ হলে একটা অবস্থান তৈরি হতো। রাজনীতিমনস্ক তরুণদের কাছে শ্রমিক রাজনীতি ও ট্রেড ইউনিয়ন তখন আকর্ষণীয় কাজের জায়গা হতো। রাজনীতিমনস্ক সংগঠনগুলোর উচিত ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

কিন্তু এই খাতের সর্বশেষ আন্দোলনও তো ব্যর্থই বলা যায়?

আমি একে পুরো ব্যর্থ বলতে চাই না। ২০১৬ সালের শেষে এবং ২০১৭ সালের শুরুতে এই যে আন্দোলন হলো তার ফলে পোশাক খাতে ১৬ হাজার টাকা মজুরির দাবিটা সামনে এলো।

মালিকরা বলছেন, আপনারা নির্ধারিত সময়ের আগেই মজুরি বৃদ্ধির কথা বলছেন–

২০১৩ সালে সর্বশেষ মজুরি নির্ধারিত হলো। চার বছর তো চলেই গেছে। এর মাঝে জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। বাড়িভাড়া বেড়েছে। মজুরি বৃদ্ধি ছাড়া উপায় কী। এরকম আইন কিন্তু রয়েছে–বিশেষ পরিস্থিতিতে মজুরি বৃদ্ধির দাবি বিবেচনা করা যায়। একজন শ্রমিক ও তার পরিবার যদি কাজ করে দিনে ২১০০ কিলোক্যালরির খাবার খেতে না পারে তাহলে সে শ্রম দিবে কীভাবে? আজকে শ্রমিকরা কীভাবে থাকে মালিকদের তা দেখা উচিত। বস্তিতেও এখন ২-৩ হাজার টাকা ঘরভাড়া লাগে।

মালিকদের আরেকটি অভিযোগ–আপনারা এখানকার শ্রমিক আন্দোলনের বিষয় নিয়ে দেশের বাইরে বিদেশে প্রচার চালান–

সাংগঠনিকভাবে আমাদের এমন কোন উদ্যোগ নেই। তবে বিবিসি বা ঐরকম কোন সংস্থার প্রতিবেদক যদি শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চায় বাংলাদেশের একজন শ্রমিক নেতা তো বাস্তব খবরই দেবেন। এটা তো তার গণতান্ত্রিক অধিকার। আবার অনেক শ্রমিক নেতা মালিকদের সঙ্গেই বিদেশে যাচ্ছেন। বিভিন্ন প্রতিনিধিদলে শ্রমিক নেতারাও থাকছেন। তারাও শ্রমিক ইস্যুতে বিদেশে কথা বলেন। এক্ষেত্রে দেশের শ্রমিকদের কী করার আছে? তাছাড়া এতে অন্যায় কী হচ্ছে?

আপনি আলাপের শুরুতে সংগঠনগুলোর ঐক্যের কথা বলছেন। শ্রমিক কর্মচারি ঐক্য পরিষদ (স্কপ)-এর মাধ্যমে সংগঠনগুলো কি ঐক্যবদ্ধ নেই?

ওটি গড়ে উঠেছিল এরশাদ শাসনামলে। এখন নতুন প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির শ্রমিক সংগঠনও আছে স্কপে। এরা কীভাবে আওয়ামী লীগ-বিএনপির শাসনামলে আন্দোলন করবে? নতুন পরিস্থিতিতে নতুন জোট প্রয়োজন।

কিছু কিছু শ্রমিক সংগঠকের সঙ্গে মালিকদের অনৈতিক বোঝাপড়ার কথা শোনা যায়। এটা কি শ্রমিক রাজনীতির অঙ্গনে কোন বড় সমস্যা?

এটা ঠিক, কিছু সংগঠন শ্রমিকদের স্বার্থ দেখার চেয়ে মালিকদের স্বার্থ বেশি দেখে। অনেক শ্রমিক সংগঠনের সম্মেলনে দেখি মালিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। কোন কোন সংগঠনের মে দিবসের প্রোগ্রামে মালিকও বক্তব্য রাখেন। তারপরও আমি এটাকে বড় সমস্যা মনে করি না। এরকম সমস্যা যেমন আছে তেমনি আবার অনেক প্রকৃত সংগ্রামীর নামে অপপ্রচারও হয়।

শ্রমিকদের দাবি-দাওয়ার ক্ষেত্রে প্রচারমাধ্যমের ভূমিকা কী দেখছেন?

আগের চেয়ে পজিটিভ মনে হলেও প্রচারমাধ্যম সরকারকর্তৃক প্রভাবিত মনে হচ্ছে। বিশেষ করে গার্মেন্ট খাতের সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে। শ্রমিক সংগঠকদের বক্তব্য সেখানে প্রচারিত হয় না।

শেষ প্রশ্ন করছি। সত্তর ও আশির দশকে দেখা যেত উচ্চশিক্ষিত রাজনীতি সচেতন তরুণ-তরুণীরা শ্রমিকদের রাজনৈতিক অধিকারের সংগ্রামে যুক্ত হচ্ছে। আপনিও স্বীকার করেছেন এখন আর তেমন দেখা যায় না। এর কারণ কী?

ষাট ও সত্তর দশকে এবং খানিকটা আশির দশকেও এই প্রবণতা ছিল। আশির দশকে এক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল উদাহরণ তাজুল ইসলাম। কিন্তু এখন কেন আসবে? আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলি। ছাত্র রাজনীতিতে খুব সক্রিয় ছিলাম, সেই সূত্রে সাংবাদিকরা জানতেন। সম্মান-শ্রদ্ধাও করতেন। সেই আমি যখন শ্রমিক রাজনীতিতে এলাম– পূর্বের সম্মান-শ্রদ্ধাটুকুতে বেশ ঘাটতি এল যেন। কারণ শ্রমিক রাজনীতির কোন মর্যাদা তৈরি হয়নি এদেশে। এটা একটা শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপার। মিডিয়া, প্রশাসন– কোথাও একজন শ্রমিক নেতা কি খুব একটা সম্মানিত? যে আমাকে মধ্যবিত্ত পেটি বুর্জোয়া রাজনীতির পরিসরে আমার মিডিয়ার বন্ধুরা মানানসই মনে করেছেন– শ্রমিক রাজনীতিতে তারাই আমাকে দেখে বিস্মিত ও হতাশ। অর্থাৎ শ্রমিক রাজনীতির সামাজিক মর্যাদা গড়ে ওঠেনি। সে কারণে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা এখানে আসছে না। আমি বা আমার মতো যারা এসেছেন তারা আসলে নিজের সঙ্গে নিজে সংগ্রাম করে টিকে আছেন।

‘বছরে ৩২ হাজার পরিদর্শনের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি আমরা’

– মোঃ মাহফুজুর রহমান ভূইয়া, উপ মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

২০১৭ সালে বাংলাদেশে শ্রম খাতে এক প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল কলকারখানার শ্রমিক নিরাপত্তা ইস্যু। এ বিষয় নিয়ে ‘সেইফটি এন্ড রাইটস্’-এর পক্ষ থেকে কথা হয় দেশের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-এর উপ মহাপরিদর্শক মোঃ মাহফুজুর রহমান ভূইয়ার সঙ্গে। ২০১৭ সালের ৫ আগস্ট এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশের শ্রমখাতে ২০১৭ সালে অনেক দুর্ঘটনা দেখেছি আমরা। আপনাদের বিবেচনায় এটা কি স্বাভাবিক চিত্র ছিল?

কিছু বড় দুর্ঘটনার কারণে চিত্রটি অস্বাভাবিক মনে হলেও গড়ে সারা বছরের হিসাবে সংখ্যাটা অস্বাভাবিক নয়। আমাদের তথ্য অনুযায়ী দুর্ঘটনার সংখ্যা কমেছে। তবে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাগুলোতে হতাহতের সংখ্যা বেশি।

আপনারা এসব ক্ষেত্রে কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করেন?

আমাদের নিজস্ব সোর্স আছে। আমাদের নিজস্ব ইনসপেক্টররা এসব তথ্য পাঠান। নিয়ম হলো কোন কারখানায় বা প্রতিষ্ঠানে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে মালিকরাই তা আমাদের ইন্সপেক্টরদের জানাবেন।

আপনারা কি দেশের সকল কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানই পরিদর্শন করেন?

আমাদের জনবলের ৫০ ভাগ অগ্রাধিকার হলো পোশাক খাত। আর বাকি ৫০ ভাগ অগ্রাধিকার অন্যান্য সকল খাত। আবার সমগ্র জনবলের বড় অংশই নিবেদিত ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও চট্টগ্রামে। এ বছরের বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৬০০ কারখানাকে কমপ্লায়েন্সের আওতাভুক্ত করা হবে।

দেশের সকল পরিমন্ডলে ধীরে ধীরে হলেও অগ্রগতি হচ্ছে। শ্রমজীবীদের কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা কমছে না কেন?

আমাদের চেষ্টা রয়েছে। সেভাবেই পরিকল্পনা হচ্ছে। শ্রমজীবীদের কাজের পরিবেশ উন্নত করা, দুর্ঘটনা ও পেশাগত অসুস্থতা কমানো আমাদের লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে ১৫০০টি কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন ও একে কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া আইএলও’র সহযোগিতায় অনেকগুলো গবেষণা হচ্ছে। যার ফলাফলকে ভিত্তি করে পেশাগত নিরাপত্তায় আরও পদক্ষেপ নেয়া হবে।

আপনার কি মনে হয় এক্ষেত্রে নীতিনির্ধারক পর্যায়ে যথেষ্ট রাজনৈতিক অঙ্গীকার রয়েছে?

রাজনৈতিক অঙ্গীকার এমন হতে হবে ‘একজন লোককেও মরতে দেবো না’। দুবাইয়ে দেখেছি গরমের দিনগুলোতে দুপুরে দুই ঘন্টা কাজ বন্ধ রাখা হয়। আমাদের এখানে শ্রমবান্ধব প্রশাসন দরকার। শ্রম মন্ত্রণালয়ে এখন চিন্তা আছে–শ্রম আইনে কোন দুর্বলতা রাখা যাবে না। প্রয়োজনে আইন লঙ্ঘনের শাস্তি বাড়ানো হবে। এই মন্ত্রণালয়ে এখন নিরাপত্তা বিষয়ে সক্রিয় একটি কমিটি আছে। সামনে আরও কিছু পদক্ষেপ নেয়া হবে।

মালিকদের মনোভাব কীরকম এসব বিষয়ে?

কিছু মালিক আছেন সতর্ক। কিন্তু সাধারণভাবে মালিকরা অনেকে উদাসীন। শ্রমিকদের দেখলেই সেটা বোঝা যাবে। শ্রমিকরাও কাজের সময় নিরাপত্তা করণীয় বিষয়ে সিরিয়াস নয়। মালিকরা সেই সুযোগটিই নেন। এটা ঠিক যে, আইনগতভাবে ও নৈতিকভাবে কারখানা নিরাপদ রাখা মালিকের দায়িত্ব। কিন্তু অন্য অনেকেরও দায়িত্ব আছে। কিন্তু আমাদের দেশে সবাই যেন ভাবছেন, নিরাপত্তা বিধি না মানলে কিছু হবে না। এরকম মনোভাব থাকলে তো দুর্ঘটনা হবেই। বুয়েট থেকে পাস করা প্রকৌশলীকেও দেখা গেছে জরুরি নিরাপত্তা সতর্কতা ছাড়াই কাজ করেছেন এবং দুর্ঘটনায় পড়েছেন। পাশাপাশি প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণেও দুর্ঘটনা ঘটে। দক্ষ অপারেটর নেই অনেক জায়গায়।

দুর্ঘটনা রোধে আইনগত সংস্কারের দরকার আছে কি?

আইন তো রয়েছে। কিন্তু অনেক সময়ই মামলাগুলো শ্রম আইনে হচ্ছে না। দুর্ঘটনার পর ক্রিমিনাল মামলা কমই হয়। যা হচ্ছে ক্ষতিপূরণের মামলা। এছাড়া সাধারণ পুলিশী মামলা হচ্ছে। আমরা পরিদর্শকদের নির্দেশ দিয়েছি মালিকের অবহেলা পাওয়া গেলে ক্রিমিনাল মামলা করতে।

বর্তমান আইনে শাস্তির ক্ষেত্রে দুর্বলতা রয়েছে। সেটা হয়তো শিগগির বাড়বে। এছাড়া দুর্ঘটনাজনিত মামলা নিষ্পত্তিরও সময় বেঁধে দেয়া হবে। বাড়বে ক্ষতিপূরণ অংকও। বর্তমানে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে সেটা ৫ লাখ টাকা হয়ে গেছে। মুশকিল হলো কোন ঘটনায় মালিক দায়ী হলেও তদন্ত করাও অনেক সময় দুরূহ হয়ে পড়ে। কারণ সেই মালিকরা রাজনৈতিকভাবে অনেক প্রভাবশালী থাকেন।

পরিদর্শকরা কাজের ক্ষেত্রে মালিকদের তরফ থেকে কেমন সহায়তা পান?

প্রকাশ্যে অসহযোগিতা করে না। তবে অনেক সময়ই দেখা যায় পরিদর্শনে যাওয়ার পর জানানো হয় ম্যানেজার বা মালিক অনুপস্থিত। অর্থাৎ যার জবাবদিহিতার কথা তিনি এড়িয়ে যাচ্ছেন। তখন আমরা চিঠি দিই। আরও পরে লেবার কোর্টে মামলা করা হয়। আমাদের দায়িত্ব এ পর্যন্ত। মামলা হলে বিষয়টি তখন আদালতের এখতিয়ারে চলে গেল। তবে শ্রম আদালতে যাওয়ার চেয়ে আমরা চেষ্টা করি অন্যান্য সকল উপায় কাজে লাগাতে।

এটা কি সত্য যে, আপনাদের জনবল সংকট রয়েছে। এরকম প্রচুর প্রতিবেদন দেখা যায় প্রচার মাধ্যমে–

এখন জনবল সংকট নেই। গতবছর ২৮০ জন ছিল, এখন ৩১৮ পরিদর্শক রয়েছে। তাদের অর্ধেক কাজ পোশাক শিল্পকে নিয়ে। আর অর্ধেক কাজ অন্যান্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে। তবে একজন পরিদর্শক তো কারখানায় প্রতিদিন যাবেন না। তিনি হয়তো একটা চেকলিস্ট ধরে একদিন সব দেখে আসেন। পরবর্তীকালে সবারই দায়িত্বশীল ও সহযোগিতামূলক মনোভাব দরকার।

আপানাদের এখানে যারা পরিদর্শক হিসেবে নিয়োগ পান–তাঁরা তো নবীন গ্রাজুয়েট মাত্র। কলকারখানার নিরাপত্তা তো একটা কারিগরী বিষয়। তাঁরা কিভাবে এটা অনুসন্ধান করেন?

মাঠ পর্যায়ে পাঠানোর আগে সবার শ্রম আইন, সেইফটি ও অন্যান্য বিষয়ে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ হয়। আমাদের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেই বটে–কিন্তু বিশেষ ধরনের ট্রেইনার আছে।

আপনাদের দেশব্যাপী পরিদর্শন কাঠামোটি ঠিক কিরূপ?

২৩টি জেলায় আমাদের অফিস রয়েছে। অনেক অফিস থেকে ২-৩টি জেলার পরিদর্শনের বিষয় দেখা হয়। ছোট অফিসগুলোতে ১৮ জন পরিদর্শকের পদ আছে। বড় চারটি জেলায় অনেক পরিদর্শক কাজ করছেন। এমুহূর্তে আমরা ১৪টি সেক্টরকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছি। শ্রম আইন হলো আমাদের কাজের ভিত্তি। ২০১৭-এর জুলাই থেকে ২০১৮-এর জুন পর্যন্ত আমরা ৩২ হাজারটি পরিদর্শনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি।

বাংলাদেশে কারখানা বা প্রতিষ্ঠান সংখ্যা বিষয়ে আপনাদের কোন হিসাব আছে?

বাংলাদেশে হকার থেকে শুরু করে বৃহৎ প্রতিষ্ঠান মিলে ৮০ লাখ অর্থনৈতিক ইউনিট আছে। তবে 'এস্টাবলিশমেন্ট' আছে প্রায় ১০ লাখ। এটা আমরা হিসাব করেছি ট্রেড লাইসেন্স ইস্যুকে বিবেচনায় নিয়ে। তবে

বাংলাদেশে হকার থেকে শুরু করে বৃহৎ প্রতিষ্ঠান মিলে ৮০ লাখ অর্থনৈতিক ইউনিট আছে। তবে 'এস্টাবলিশমেন্ট' আছে প্রায় ১০ লাখ। এটা আমরা হিসাব করেছি ট্রেড লাইসেন্স ইস্যুকে বিবেচনায় নিয়ে।

এস্টাবলিশমেন্টগুলো নিয়ে কোন নির্ভরযোগ্য ডেইটা নেই। আমাদের নিজস্ব হিসাবে ২৭ হাজার কারখানা আছে। যেগুলো আমরা বছরে অন্তত একবার পরিদর্শন করতে তৎপর।

আপনাদের পরিদর্শকদের তো বিচারিক ক্ষমতা নেই। এ বিষয়ে আপনাদের অভিমত কী?

ঐরূপ কিছু ক্ষমতা আমাদের থাকা উচিত। যেমন ধরা যাক, নিরাপত্তা ও শ্রমিকদের বেতন-ভাতা বিষয়ক অনিয়মের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক কিছু পদক্ষেপের জন্য এইরূপ ক্ষমতা না থাকায় যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া যায় না। চিঠি চালাচালি করে পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটানো কঠিন ও সময়সাপেক্ষ হয়ে পড়ে।

গার্মেন্ট খাতে বাংলাদেশের শ্রম নিরাপত্তার বিষয় নজরদারি করতে বিদেশীরাও কাজ করছে। অ্যাকর্ড (Accord on Fire and Building Safety) **ও অ্যালায়েন্স** (Alliance for Bangladesh Safety)**-এর কথা বলছি। তাদের সঙ্গে আপনাদের সমন্বয় কেমন? তাদের আসাটা কি আপনাদের ব্যর্থতার স্মারক?**

তাদের সঙ্গে সমন্বয় আছে। একসঙ্গেই অনেক কাজ করছি। তাদের আগমনের পটভূমিটি ছিল দু'তিনটি বড় দুর্ঘটনা। যাতে মনে হয়–পোশাক কারখানাগুলো যেসব ভবনে সেগুলো বড় আকারে যাচাইবাছাই প্রয়োজন। তারা এ পর্যন্ত ৩ হাজার ৭৮০টি কারাখানা দেখেছে। এর মধ্যে ১৬২টি ঝুঁকিপূর্ণ পাওয়া গেছে। মাত্র ৩৯টি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ৪৭টিকে ভবনের লোড কমাতে বলা হয়েছে। তারা আসায় কিছু কাজে ভালো অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু এখন তারা নিরাপত্তা ইস্যুতে অতিরিক্ত কিছুও তদন্তের দাবি করছে। আবার ট্রেড ইউনিয়নের বিষয়টিতেও মনযোগ দিতে চাইছে। ওরা মনে করে এখানে গার্মেন্টস খাতে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারকে ফাংসানাল হতে হবে। কিন্তু মালিকরা চাইছে না– অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স অধিকারের বিষয় নিয়েও কাজ করুক।

‘শ্রম আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি আদালত হওয়া প্রয়োজন শিল্প এলাকাগুলোতে’

- মোঃ বরকত আলী, আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

শ্রম আইন ও শ্রম আদালতে শ্রমিকদের আইনগত লড়াইয়ের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা জানতে বিশিষ্ট আইনজীবী মোঃ বরকত আলীর এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করা হয় ২০১৭ সালের ১৮ আগস্ট, ঢাকায়।

একজন আইনজীবী আইন তৈরি করেন না, শুধু বিদ্যমান আইনের আলোকে কাউকে আইনী পরামর্শ দিয়ে থাকেন; বিশ্লেষণ করেন। সেই আলোকেই জানতে চাইছি–বাংলাদেশের শ্রম আইন কতটা শ্রমিকবান্ধব?

পূর্বের ২৫টি আইনকে বিলুপ্ত করে ২০০৬ সালে একটি নতুন শ্রম আইন তৈরী করা হয়েছে, যা একেবারে খারাপ নয়। কিছু অধিকারের রক্ষাকবচ আছে সেখানে। আবার অধিকারের সুরক্ষার নামে ফাঁকফোঁকরও আছে। যেমন বলা হয়েছে, কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করা যাবে– তবে রেজিষ্ট্রীকরণের ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ শ্রমিককে সদস্য হতে হবে। ধরা যাক একটা কারখানায় ৫ হাজার শ্রমিক কাজ করে, তাহলে সেখানে ১ হাজার ৫০০ শ্রমিককে সদস্য করেই ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে; তা না হলে উক্ত ট্রেড ইউনিয়ন যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। এটা অনেক দুরূহ একটি প্রক্রিয়া। আবার সদস্য করে নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করা হলে অনুমতির আগেই সরকারি কর্তৃপক্ষ সেটা অবহিত করবেন কারখানার মালিককে। তখন দেখা যায়, রেজিস্ট্রেশনের আগেই এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্তদের বা উদ্যোগে সম্মতিদাতাদের চাকুরি নাই। অর্থাৎ বলা যায়, ট্রেড ইউনিয়ন যাতে গঠিত না হয়–তারই ব্যবস্থা করা হয়েছে আইনী এই প্রক্রিয়ায়। চাকুরি হারানোর ঝুঁকি নিয়ে নিশ্চয়ই সাধারণ শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন করতে চাইবে না।

এই আইনের কোন ব্যত্যয় হচ্ছে কি না– সেটা দেখার জন্য তো কর্তৃপক্ষ রয়েছে–

তা রয়েছে। কিন্তু তারা বছরে কয়দিন সংশ্লিষ্ট কারখানায় যেতে পারবেন? তাদের লোকবল পর্যাপ্ত কি না? তারা কি মালিকদেরকে আইন পালনে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছেন কি না? যদিও আইনের লঙ্ঘন হলে আদালতে যাওয়ার সুযোগ আছে, সেটিই বা কতটা সহজ ও বাস্তব সম্মত? বিশেষ করে বিচার ব্যবস্থায় যে দীর্ঘসূত্রিতা রয়েছে– তাতে ন্যায়বিচার পেতে ২-৩ বছর ঘোরাঘুরির পরও অনেক সময় শ্রমিক কোন প্রতিকার না পেয়ে হাল ছেড়ে দেয়।

শ্রম আইনের বিষয়ে আপনার আর কোন পর্যবেক্ষণ?

এই আইনে এমন অনেক বিধান রয়েছে যার বাস্তবায়ন হচ্ছে না। আইনের বাস্তবায়নের দিকে মনযোগ দেয়াই বেশি জরুরি। যেমন- মাতৃত্বকালীন ছুটি ও প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জানা যায়, গর্ভবতী নারী শ্রমিককে মাতৃত্বকালীন ছুটি ও প্রসূতি কল্যাণ সুবিধার পরিবর্তে চাকুরী হারাতে হয়। আবার ওভারটাইমের হিসাব ও ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনিয়মের কথা শুনা যায়। সাধারণ নিয়ম হলো একজন প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিক দৈনিক এক ঘন্টা বিরতিসহ আট ঘন্টা কাজ করবে এবং প্রয়োজনে ওভারটাইম করবে ২ ঘন্টা। কিন্তু আমরা দেখতে পাই শ্রমিকরা কারাখানায় ঢুকছে সকাল ৮টায়, আর বের হচ্ছে রাত ৮টায়, হিসেবে তার ৪ ঘন্টা ওভারটাইম হবার কথা; কিন্তু শ্রম আইন অনুযায়ী দৈনিক ২ ঘন্টার বেশী ওভারটাইম করার কোন বিধান নাই। অনেক সময় সেই ২ ঘন্টার ভাতাও ওভারটাইমের হিসেবে না দিয়ে থোক হিসেবে দেয়া হচ্ছে। অন্যদিকে পিস রেটের কাজ হয় এমন কারাখানাগুলোতে ওভারটাইমের বিষয়টিই অকার্যকর করে রাখা হয়েছে।

তারপর ধরা যাক, ‘পার্টিসিপেটরি কমিটি’ বা অংশগ্রহণকারী কমিটির কথা। আইনে মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এ কমিটির গঠনের কথা বলা হয়েছে, বাস্তবে হয়ত তা-ই হচ্ছে; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুনা যায়, ট্রেড ইউনিয়নের বিকল্প হিসেবে অংশগ্রহণকারী কমিটিগুলো গঠন করা হচ্ছে, যাতে মালিক নিজের পছন্দসই শ্রমিকদেরকে অন্তর্ভূক্ত করছেন। এভাবেই তাঁরা শ্রম আইনের বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন।

এসবের প্রতিকারের পথ কী?

শ্রমিকরা একতাবদ্ধ না হলে টেকসই কোন প্রতিকার সম্ভব নয়। আইনে যেসব ভালো বিধান আছে সেসব কার্যকর করতে হলে শ্রমিকদের একতাবদ্ধ হওয়া একটা পূর্বশর্ত। একজন শ্রমিক যখন দেখে তার অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে তখন সে কোথায় যাবে? অনেক সময় সে কোন উপযুক্ত

> সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো মামলার জট। সবকিছু ঠিকভাবে এগোলেও দীর্ঘসূত্রিতাকে এড়ানো যায় না। ২-৩ বছর মামলা লড়া একজন শ্রমিকের জন্য সহজ নয়– বিশেষত যখন সে এক জায়গায় অধিকার হারা হয়ে আরেক জায়গায় যোগ দিয়ে দিচ্ছে।

স্থান বা প্রতিনিধি খুঁজে পায় না, তখন অথৈ সাগরে পড়ে যায়। আবার যখন কোন শ্রমিক প্রতিকারের প্রত্যাশায় আদালতে যায়, সেখানেও তো তাকে অর্থ দিয়ে একজন আইনজীবী নিয়োগ করতে হয়, যা একজন গরীব শ্রমিকের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পরে। বিদ্যমান যেসব ট্রেড ইউনিয়ন আছে তাদের কাছেও যেতে পারে শ্রমিক। কিন্তু সেখানেও এমন শুনা যায় যে, প্রাপ্ত সুবিধার একটি অংশ কেটে রাখা হয়। কিছু কিছু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে সালিস ও মামলার মাধ্যমে সহায়তা করে থাকে। এসকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত স্বল্প খরচে প্যানেল আইনজীবীদের মাধ্যমে মামলা পরিচালনা করে থাকে। ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্যানেল আইনজীবীর ব্যক্তিগত মামলা অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। আবার সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো মামলার জট। সবকিছু ঠিকভাবে এগোলেও দীর্ঘসূত্রিতাকে এড়ানো যায় না। ২-৩ বছর মামলা লড়া একজন শ্রমিকের জন্য সহজ নয়– বিশেষত যখন সে এক জায়গায় অধিকার হারা হয়ে আরেক জায়গায় যোগ দিয়ে দিচ্ছে। মামলার জন্য তার আসা-যাওয়াও অনেক কঠিন হয়ে পড়ে।

শ্রম আদালতগুলোতে মামলার কি অনেক জট?

ঢাকার ৩টি আদালতে বর্তমানে প্রায় ১৫ হাজার মামলা জমে আছে। আবার প্রতিনিয়ত যুক্ত হচ্ছে নতুন মামলা। শ্রমিকরা এই দীর্ঘসূত্রিতার কারণে অনেক সময় মামলার প্রতি Interest হারিয়ে ফেলে, এমনকি বিচার ব্যবস্থার উপরই আস্থা হারিয়ে ফেলে। শ্রম আদালতের সংখ্যা বাড়ানো উচিত। পঞ্চগড়ের একজন শ্রমিককে শ্রম আদালতে মামলা করতে হলে রাজশাহী আসতে হয়। আর সেই মামলার আপীল প্রয়োজন হলে আসতে হয় ঢাকায়। এটা তার জন্য দুরূহ একটা বিষয়। আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি শিল্প এলাকাগুলোতে আদালত হওয়া প্রয়োজন।

আইনে তো এমন বিধান রয়েছে যে, ৬০ দিনের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করতে হবে?

হ্যাঁ, ৬০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির কথা আইনে বলা আছে। আবার এটাও বলা আছে যে, কেবলমাত্র বিলম্বে প্রদানের জন্য আদালতের কোন রায় বা সিদ্ধান্ত অবৈধ হবে না। এর অর্থ হচ্ছে ৬০ দিনের বিষয়টি কোনভাবেই বাধ্যতামূলক নয়। বাস্তবতা হলো একটি মামলা নিষ্পত্তি হতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কমপক্ষে ২-৩ বছর সময় লেগে যায়। আবার মামলার রায় শ্রমিকের পক্ষে হলেও তা বাস্তবায়নের জন্য আরেকটি মামলা করতে হয়। অন্যদিকে মালিক পক্ষ শ্রম আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে অনেক সময় হাইকোর্টে রীট করেন। সেখানেও আবার দীর্ঘসূত্রিতা তৈরি হয়।

একজন আইনজীবী হিসেবে শ্রমিকদের কোন সমস্যাগুলো নিয়ে আপনাকে বেশী মামলা করতে হয়?

বকেয়া মজুরি ও টার্মিনিশেন বেনিফিটের মামলাই বেশি। অনেক শ্রমিককেই ২-৩ মাসের বকেয়া না দিয়ে চাকুরিচ্যুত করা হয়। চাকুরিচ্যুত করতে হলে ৪ মাসের নোটিশ দিতে হবে বা ৪ মাসের মজুরি দিতে হবে। কিন্তু এমন ঘটনা প্রচুর এসব কোনটা না করেই শ্রমিককে চাকুরিচ্যুত করা হয়। আবার চাকুরিচ্যুতির বিষয়টি শ্রমিক কারখানা থেকে দিন শেষে বাড়ি যাওয়ার সময় জানাতে পারে না, সে যখন পরদিন কাজে আসে তখন গেইটে প্রহরী তাকে সেটা জানায়। এই হলো শ্রমিকদের চাকুরিচ্যুতির পথ। একজন শ্রমিক সকাল বেলা যখন গেইটে চাকুরিচ্যুতির বিষয়টি জানতে পারে–তখন সে কি করবে? তার কি করা উচিত? কার কাছে যাবে?

এইরূপ পরিস্থিতির অবসানে আপনার মতে শ্রম আইনে কিরূপ সংশোধনী দরকার?

ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার পাওয়া সহজ করা দরকার। ৩০ শতাংশ শ্রমিকের সদস্যভূক্তির বিষয়টি তুলে দেয়া দরকার। মালিকপক্ষ কিন্তু অতি সহজেই তাদের সমিতি করছেন, কিন্তু শ্রমিকরা পারছেন না। অন্যদিকে পার্টিসিপেটরি কমিটির নামে যা হচ্ছে শুনা যায় তার পরিবর্তে শ্রমিকদের প্রকৃত প্রতিনিধিদের নিয়ে এসব কমিটিকে সক্রিয় করা দরকার।

এসবের বাইরে শ্রম আইনে আরেকটি বিষয় যুক্ত হওয়া প্রয়োজন– তাহলো যৌন হয়রানি রোধে অভিযোগ উত্থাপন ও বিচারের প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা। বর্তমানে শ্রম আইনে যৌন হয়রানির শাস্তির কোন সুস্পষ্ট বিধান নেই। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের এ মর্মে রায় রয়েছে যে, সকল সরকারী, বেসরকারী ও সায়ত্বশাসিত এবং শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি বিষয়ক অভিযোগ কমিটি থাকতে হবে। কিন্তু শ্রম আইনে এ বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। আমাদের জানা মতে যৌন হয়রানির বিস্তর ঘটনা ঘটছে। নানান স্তরের উর্ধ্বতনদের খুশি রাখতে এটার প্রতিবাদ হয় না। তাছাড়া এইরূপ ঘটনার প্রতিকার কার কাছে চাইবে শ্রমিকরা?

ক্ষতিপূরণ বিষয়েও শ্রম আইনের সংশোধনী প্রয়োজন। বর্তমানে মৃত্যু ঘটলে এক লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ। আহত হয়ে স্থায়ী কর্মক্ষমতা হারালে এক লাখ ২৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ। টাকার অংকের চেয়ে জরুরি হলো ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের পদ্ধতি। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের এই পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ। আমার দৃষ্টিতে আইএলও কনভেনশন ১২১, মারাত্মক দূর্ঘটনা আইন, ১৮৫৫ এবং উচ্চ আদালতের নজিরের আলোকে ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত হওয়া উচিত এবং জোর দেয়া উচিত দুর্ঘটনায় আহত-নিহতদের 'লস অব আর্নিং'-এর বিষয়ে। বেঁচে থাকলে বা সুস্থ থাকলে তিনি কতদিন আয়-রোজগার করতে পারতেন সেটার হিসেব করতে হবে। তার সঙ্গে তুলনা করে আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করতে হবে। এছাড়া আহত অবস্থার চিকিৎসা খরচ মালিক পক্ষকে বহন করতে হবে।

আপনার অভিজ্ঞতায় শ্রমিক-মালিক শ্রম আইন সম্পর্কে কতটা সচেতন?

শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতার অভাব আছে। কিন্ত মালিকদের মধ্যে অধিকাংশ মালিকই শ্রম আইন সম্পর্কে জানেন। আমার নিজের ধারণা তারা অনেকেই আইন আইনজীবীর চেয়েও শ্রম আইন ভালো জানেন। তাদের সমস্যা হলো আইন পালন করবেন কি করবেন না– সেটা।

২০১৭ সালে আশুলিয়া ও গাজিপুরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, ইদানিং শ্রমিকরা মজুরি বা অনুরূপ দাবি দাওয়া নিয়ে কারখানা চত্বর তো দূরের কথা, রাস্তায়ও মিটিং করতে পারছে না। শ্রমিকদের তা হলে করণীয় কী?

দাবি দাওয়ার কথা বলা অবৈধ কিছু নয়। মজুরি নিয়ে স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার তো একজন শ্রমিকের আছে। মালিকরা প্রশাসনকে প্রভাবিত করছেন মর্মে জানা যায়- তাই এই অবস্থা হচ্ছে। আশুলিয়ায় শ্রমিকদের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনের এমন ধারায় মামলা করা হয়েছে যে ধারা বহু আগেই বিলুপ্ত হয়েছে। শ্রমিকদের এইরূপ অস্থিত্বহীন আইনের ধারাতেই কারাগারে পাঠানো হলো। কারণ ঐ ধারাটি ছিল জামিন অযোগ্য।

ইদানিং মজুরি নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে। মজুরি নির্ধারণ বিষয়ে আইনজীবী হিসেবে আপনার পরামর্শ কি?

ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের সময় একজন শ্রমিককে তার পরিবারের অন্যান্যদের নিয়ে জীবন যাপনের জন্য ন্যূনতম খরচের পরিমাণ বিবেচনা করা প্রয়োজন। অর্থাৎ একজন শ্রমিক তার আয় দিয়ে ৪-৫ জনের একটি পরিবার নিয়ে চলার মতো মজুরি তাকে দিতে হবে। কিন্তু বর্তমানে মজুরি নির্ধারণের সময় লিভিং ওয়েজ-এর বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয় না। এক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজন পদ্ধতিগত পরিবর্তন।

আপনি কি মাতৃত্বকালীন ছুটি বা মজুরি নিয়ে কোন বিবাদ পান না?

এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এরকম বিবাদও আসে। ছুটির সমস্যা তো আছেই, অন্যদিকে সন্তানসম্ভবা নারী শ্রমিকদের ১৬ সপ্তাহ মাতৃত্বকালীন ছুটি পাওয়ার কথা, সে সাথে মাতৃ কল্যাণ সুবিধাও। কিন্তু বিভিন্ন নারী শ্রমিকদের মাধ্যমে জানা যায়, তারা সাধারণত মাতৃত্বকালীন ছুটি বা প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা পান না; কখনও ছুটি পেলেও পুনরায় কাজে যোগ দেবার সময় তার চাকুরিকাল নতুন করে গণনা শুরু হয়। তার মানে পুরানো সার্ভিস বেনিফিট তাকে হারাতে হয়। প্রমোশনের ক্ষেত্রেও এ রকম সমস্যা অনেক সময় দেখা যায়। অনিয়মের বহু রকমফেরের কথা শুনা যায়।

The State of Labor in Bangladesh 2017
Executive Summary of the main report

The scenario of Bangladesh's Labor rights was not encouraging in 2017. All the news we have received from the Labor sector, related to worker interest, among them very few were positive. Accident, wage discrimination, the lack of trade union rights, arbitrary arrest, natural calamities, and silence in the national politics concerning worker rights… these were the main characteristics of this year.

In accordance with international labor standard, Bangladesh lags behind for a long time – but no sign of giving effort to move ahead was noticed in 2017.

This year, International Trade Union Confederation (ITUC) mentioned in its global report, that, by the criteria of worker rights, Bangladesh found its place in the list of the worst 10 countries. The other 9 countries are: Columbia, Egypt, Guatemala, Kazakhstan, Philippines, Qatar, South Korea, Turkey, and United Arab Emirates. The report named 'ITUC Global Rights Index 2017', it has been stated that, Bangladesh is not safe at all for things like worker killing, granting trade union rights of workers, harsh attitude to labor movement, and dangerous working condition. Bangladesh got 5 in the rating, due to constant pressure on the trade union activists, by government and employers. It means, there is no guarantee of worker rights. India, Pakistan, and Myanmar also got 5 in the rating. Sri Lanka and Nepal are in a better position. Their rating is 3. It means, regular violation of rights is not common there. In the report, to hold the overall position of a country in implementing worker rights, numbers ranging from 1 (the lowest) to 5 (the highest) has been given. If a country gets 5, it means, nothing like labor rights exists there. If a country gets 1, it means, workers in that country are receiving all the just rights in general. It is said in the report that anti-trade union attitude are present in Bangladesh, both in methodological and practical level. ITUC says, "In the beginning of 2017's January, Bangladesh government has dismissed more than 1600 workers and cases have been filed against 600 workers and trade union activists."

ITUC has prepared the above-mentioned report on the basis of available information from April 2016 to March 2017. In the report, labor condition of 139 countries has been shown.

In June 2016, it has been said in International Labor Organization's (ILO) Geneva

A good news

In 2017, a good news for the labor sector was the beginning of money deposit in Lobor Welfare Fund. In the present labor law, it is obligatory for a company if the company's paid up capital is 10 million taka or fixed assets value is 20 million taka; then they have to spend 5% of the net profit they declare at the end of the year in workers welfare. One tenth of this 5% will be deposited in the workers welfare fund created under labor and employment ministry. Though money deposit in this fund began in 2013, it has accelerated in 2017. Up to this day, the size of this fund is 2.5 billion taka, and 94 institutions – national, as well as foreign – have started depositing money in this fund.

Conference, that, the Bangladesh government will have to take necessary steps to ensure the rights of the workers to organize themselves for improving their rights, and at the same time, it has to take bold steps to stop anti-trade union discriminatory behavior and violence, within November. During that time, the government will have to inform ILO's specialist committee in detail, that what actual steps they have taken in that area.

The areas ILO wanted to see change included: to ensure Bangladesh Labor Law and regulations' compatibility with international charter concerning the right to organize, to ensure the right to organize in draft EPZ law, to give back jobs to those who has been dismissed after investigation concerning trade union activities in Ashulia and other areas, to take compensation from alleged people according to the law, or file lawsuits, and last but not the least, to register trade union as soon as possible. In ILO's International Labor Conferences' (ILC) report related to charter realization and recommendation, these issues has been put forward.

In Bangladesh's labor sector, another mention-worthy event of this year was, the `Accord's wished to work in second term (till 2021) for labor rights in the garments sector, but Employers' Organization BGMEA and Government were opposition to it.

`Accord` is the alliance of those international buyers' who buy garments from Bangladesh. After they expressed their wish to work for the labor rights of garments workers, government and factory owners objected. This happened in the last week of July.

When Accord expressed their eagerness to work with garments workers' rights, Bangladesh's commerce minister Tofail Ahmed objected, and told BBC that, it is not the duty of Accord to look after workers' rights, ILO is there to do that. But among the brands and buyers who are allied with Accord, 24 have signed in defense of Accord's second term activities. Many international workers' rights organizations; like IndustryAll, Clean Cloth Campaign; are trying to convince other brands. Till preparing this report, there was a common agreement on the point that, Accord and `Alliance` are not going to stay for the second term. Their activities will end in 2018 if Bangladesh achieves the technological capability to carry on their activities by its own. Otherwise, Accord will increase its time by six months. It has been known that, 'Alliance for Bangladesh Worker Safety', North American buyers' alliance in the same sector, are not remaining in the task of safety-related supervision in Bangladesh. Alliance's country director James Moriarty has confirmed the matter to BGMEA's chairman Siddiqur Rahman through an email. In the meanwhile, a project under ministry of labor named Remediation Coordination Cell (RCC) will receive the responsibility from Accord and Alliance. RCC has been open from the middle of 2017, but its main activities have

Budget: Considering allocation for workers

In 2017-18 national budget, total allocation was 4002 billion crore taka. For labor and employment ministry, only 2.62 billion taka is allocated. The noteworthy point is, national budget increased, but the allocation for the ministry of labor and employment decreased. In 2016-17 fiscal year, national budget was 3406 billion crore taka. In that year, 3.07 billion taka was allocated for the ministry of labor and employment. That means in 2017-18 fiscal year, national budget has increased 17% than the previous year,but the allocation for the ministry of labor and employment has decreased 15% than the previous year. In fact, observation has also found out, in the last fiscal year, the allocation for the ministry of labor and employment was less than the allocation of any other ministry. [...*Details in chapter 6*]

remained relatively slow till the end of 2017.

On the other hand, in a letter written to Bangladesh Prime Minister dated 23 February, 11 members of US Congress have stated that, concerning labor rights, Bangladesh is moving in a wrong direction.

The congress members who signed the letter to the PM are as follows - Jan Schakowsky, Sander Levin, Bill Pascrell, Bobby Scott, James P. McGovern, Mark Pocan, William Keating, Jackie Speier, Joseph Crowley, Steve Cohen, and Barbara Lee. The copies of this letter has been given to these buyers of readymade garments: Berkshire Hathaway, Carters, Gap Inc., H&M, JC Penny Company, Kohl's, PVH, Sears Holding Corporation, Target, VF Corporation, and Wal-Mart.

It is mentioned in the letter that, "As friends of Bangladesh and advocates of a strong U.S.-Bangladesh relationship, we write to express our serious concern regarding the arrest and detention of labor leaders in the garment industry who have been engaged in peaceful activity in many areas of Bangladesh."

In the meantime, the representative team of European Union (EU) has said in an interview which took place at Dhaka, on 27 March, that, trade union rights of the workers working at different Export Processing Zones (EPZ) of the country have to be ensured. They want the implementation of Labor Law in the EPZ areas for that. To ensure trade union liberty, and simplify the registration process, they want the revision of that law too. In a meeting with BGMEA leaders, the representatives of European Parliament have told this. The meeting was held at the Westin hotel of the capital city. It has been known from different sources, at the time of that visit, that, while raising the question of labor rights, EU is also looking for assessing the matter of GSP facilities. EU parliament members have come to Dhaka to assess the matters related to labor rights. But, during the visit, the leader of the team Arne Lietz didn't talk anything about GSP facilities.

Attempt to revise the labor law

In 2017, a big event in the labor sector is, the attempt to revise the labor law. In June, the government has founded a tripartite committee for that ILO is giving pressure to make Bangladesh Labor Law more worker-friendly and nearer to international standard. Thus the initiative for reforming the current law has been taken. This is the 4th attempt to revise the labor law after its formation. In fact, it has been the destiny of the law to be revised again and again, this is because when the law was legislated in the national assembly in 2006, it was not well discussed.

[*...Details in chapter 11*]

In the meantime, throughout the year, worker organizations of readymade garments sector carried out movement with the demand of 16,000 taka as minimun wage, with 10,000 taka as basic.

In 2017, another major characteristic of the labor sector was the unemployment crisis. In the last labor force census, it has been found that, almost 2.6 million people are unemployed in this country. The rate of unemployment is greater among the higher educated, that is something to be worried about. This issue has been focused in detail in the second chapter of this report. Economists also expressed their worries about the ever-increasing wage gap. It has been seen in the study[24] published this year, 46.2% of national income has been concentrated in the hands of top 10%. In the third chapter of this report, the reader has been provided with contemporary data on economic inequalities. Even in the face of economic progress, and even in the labor

[24] Politics, Governance and Middle Income aspirations: Relities and Challenges, PPRC and UNDP, 2016, Dhaka.

Wage gap increasing poverty and inequality in the society

In Bangladesh, the difference between the income of 10% high-income households and 40% low-income households is 1380%. In recent years, when a household from 10% high-income earns 1 lakh 47 thousand 388 taka in average per month, a household from 40% low-income earns 10 thousand 657 taka in average per month. In the last 46 years, the earnings of low-income 40% people has decreased 4.9%, in gross national income. It is unnecessary to mention that, among the low-income families, the working people are the majority.

[*...Details in chapter 3*]

sector where growth is on the rise, the basic necessities of the workers have been denied and they are in deep crisis. In chapter four, this report discusses on mny industrial sector, giving particular focus on tea and leather sector. Here, the latest condition of workers movement in leather sector, and its historical background has been described. In chapter 5, investigative discussion has been carried out on the reflection of labor and worker interest in national budget, and on the demands raised by the workers in that area. After that, a scene from last year concerning occupational health and safety of the workers has been shown. Here, before and after of Tampaco factory accident has been analyzed as a special case. The latest situation of rural agricultural workers and women workers has been discussed in separate chapters. This report also discusses the crisis of the Dalits as one of the worker community of this country. Inevitably came the issue of trade union. Last but not the least, the attempt government has taken regarding revisiting labor law and the opinion by trade unionists and labor specialists on that issue has been described in two separate chapters.

Contents of the report

Note from Safety and Rights Society

1. The state of labor in Bangladesh 2017
2. The scenario of population and employment: The rate of unemployment is greater among the educated
3. Dynamics of labor economy: Wage discrimination of the workers, and fall of their share in the national property
4. Situation analysis on most talked-about sectors': Readymade garments, migrant workers, tea workers, construction workers and workers who work in stone-breaking industry
5. Workers movement 2017: Two case studies (leather industry, and the movement to protect agricultural land in Chunarughat by the tea workers)
6. Analysis of the national budget allocation for the Ministry of Labor and Employment
7. The scenario of occupational health and safety in 2017
8. Women workers: Transport crisis and wage gap
9. Dalit workers: The situation is unchanged
10. The helplessness of agricultural workers: Crisis in Haor area
11. The attempt to revise labor law: The demand to include domestic workers and agricultural workers
12. Trade union rights: Practice, obstacles, and debate
13. Tampaco accident: Most of the workers are still jobless
14. Interview: Trade Union Leader, Factory Inspector, Lawyer

বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি
ও
শ্রম অর্থনীতি ২০১৭

Safety & Rights

Promoting Safety, Enforcing Rights

সইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস)
১৪/২৩ বাবর রোড (৫ম তলা)
ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
ফোন: +৮৮ ০২ ৯১১৯৯০৩-৪, +৮৮ ০১৯৭৪৬৬৬৮৯০
ই-মেইল : info@safetyandrights.org
ওয়েবসাইট : www.safetyandrights.org